কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, পক্ষে—শ্রীসরোজনাথ সরকার এম. এ., বি. এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ১৪, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট শ্রীপতি প্রেস, পক্ষে—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৭

মূল্য—২।০

* উপহার *

—সূচী—

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	একদম্ বাঁধ্‌কে জনানা !	১
২।	তুমি আমারি !	১০
৩।	স্বয়ংবর	২৪
৪।	আত্মহত্যা	৩৩
৫।	জয়হিন্দ	৩৯
৬।	সত্যঘটনা	৪২
৭।	হাস্যরস	৪৭
৮।	গরু ও ঘাস	৫১
৯।	হরিজন	৫৪
১০।	মুক্ত পাগল	৫৮
১১।	স্বাক্ষর শিকার	৬৩
১২।	বক্স নাম্বার	৬৮
১৩।	আন্‌এমপ্লয়মেন্ট	৭৫
১৪।	পাশবিক পার্টিশন কাউন্সিল	৮০
১৫।	হিউমার	৮৫
১৬।	বাক্স	৯০

—চিত্র সূচী—

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা"	...	৩৭
	'Man is a laughing animal না	...	৪৯
৩।	চোখ উল্টিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে সে	...	৪৩
৪।	সারা রাত্রি প্রলাপের মধ্যে······	...	৭
৫।	মশাই, আপনাকেই খুঁজছিলাম !	...	১২
৬।	'দাঁড়ান মশাই ঠিক ঐ জায়গায়—আপনার···	...	৬১
৭।	'বাঘের মত থাবা বুকের ওপর এসে পড়ল'	...	৬৫
৮।	'সবচেয়ে শঙ্কাজনক তরুণদের সান্নিধ্য'	...	৭১
৯।	'মুখটা চেনা মনে হ'ল' ...	...	৭৮
১০।	হিন্দু ও মুসলমান এলাকার বাঁদররা	...	৮১
১১।	'আয়নাটার সাম্নে দাঁড়িয়েছিলাম'	...	৮৭
১২।	'লুঙ্গি পরে ফুঙ্গি সেজে' ...	...	৯২



ফেলুর ঘরে ঢুকিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ড্রেসিং মিররের সামনে দাঁড়াইয়া সে একমনে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করিতেছে। মুকুরে আমার প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছিল কি না জানি না। মুখ-ভঙ্গিমা সমান তালেই চলিল দেখিয়া বুঝিলাম, আমার পদশব্দও সে টের পায় নাই। হতভম্ব হইয়া দেখিতে লাগিলাম কখনও ভ্রূ কুঁচকাইতেছে, কখনও ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা

টানিবার চেষ্টা করিতেছে—কখনও আবার কল্পিত শত্রুর প্রতি চোখ পাকাইতেছে। তবে কি ফেলু পাগল হইল? কই এ খবর ত পাই নাই।

ফেলু আমার একমাত্র ভাগিনেয়। কলিকাতার মেসে থাকিয়া বি. এ, পড়ে। আমার সহিত বয়সের খুব বেশী পার্থক্য না থাকায় মামা-ভাগ্নের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমি বর্দ্ধমানে মাষ্টারি করি। মাসে দু'একদিনের জন্য কল্‌কাতায় আসিয়া ফেলুর মেসেই উঠি। আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আবার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাই। ফেলু বরাবরই খুব লাজুক ধর্ম্মভীরু ছেলে। মেসে কুনো বলিয়া অখ্যাতিও আছে। সিনেমা-থিয়েটারের ধার দিয়াও সে ঘেঁষে না। এমন কি বেলুড় মঠের কোন স্বামীজীর কাছে সে দীক্ষা লইয়াছে। আমিও দু'একবার তাহার সহিত সেখানে গিয়াছি। মেসের একটি ছোট ঘরে সে একলা থাকে। দেয়ালে পরমহংস-দেবের ছবি সযত্নে টানাইয়া রাখিয়াছে। ধূপ-দীপ সহকারে নিত্য পূজা করিয়া থাকে। এহেন ফেলু হঠাৎ অদ্ভূত অঙ্গভঙ্গী করিতে সুরু করিবে, আমার কল্পনার অতীত। তবে কি সে ফুটবল খেলা ধরিয়াছে? কিন্তু সে খেলায় মুখভঙ্গীর প্রয়োজন হয় না। ভাবনার কুলকিনারা না পাইয়া তাহাকে ডাকিতে যাইব—এমন সময় সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব মিহি সুরে বলিল,—"মামা নাকি? কখন এলে গো!" হাতের সুটকেশ হাতে রহিল— বিস্মিত লোচনে দেখিলাম, তাহার মুখময় পাউডার—ভাদ্রের গরমে ঘাম গড়াইয়া পড়িয়া বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। ফেলুর হেঁড়ে গলা হঠাৎ মিহি হইয়া

উঠিল কিরূপে? বুঝিলাম দেহের উর্দ্ধতন বিভাগে কোন গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। ধর্ম্মচর্চ্চাই কি আর বেশী করা ভাল?

ঘর্ম্মসিক্ত টুইলের শার্ট পিঠে আঁটিয়া বসিয়াছিল। জামা খুলিয়া তক্তপোষে বসিয়া পড়িলাম। ফেলুকে বলিলাম দে একখানা পাখা দে। সে হাত ঘুরাইয়া সুরে বলিয়া উঠিল—

"ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোরনা পাখা।"

একে হাওড়া ষ্টেশনে বাসে ওঠার ধাক্কাধাক্কি, এই পচা গরম, তার ওপরে ফেলুর এই অস্বাভাবিক ইয়ার্কি সহ্য হইল না। হাজার হোক মামা বলিয়া কিছু সম্ভ্রম ত' করা উচিত। ফেলুর কান ধরিয়া এক ঝাঁকি দিতেই চোখে পড়িল তার কপালে টিপ ও বাঁ গালে ক্রমবিলীয়মান পাউডারের ওপরে একটি কাল তিল। এসব কি ন্যাকামি! ফেলু কাঁদ-কাঁদ হইয়া আধা-মিহি আধা-হেঁড়ে গলায় বলিল, "মামু দোষ নিও না, অভিনয়ের খাতিরে এরকম করতে হচ্ছে।"

অভিনয়? ফেলুর সহিত অভিনয়ের কি সম্পর্ক? আর অভিনয় মানেই যে মেয়েলী ন্যাকামি তাও ত জানিতাম না। আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যাপারটা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—ফেলু "মানময়ী গার্লস স্কুল" নাটকে নীহারিকার ভূমিকা লইয়াছে। তাহাদের মেসে কে এক তারক মুখুজ্জে আসিয়াছে, নূতন বোর্ডার হিসাবে। তাহার নটমহিমা অপার। তিনিই সভ্যদের লইয়া নাটক মঞ্চস্থ করিবেন স্থির করিয়াছেন। বোধ হয়

সবচেয়ে গোবেচারা দেখিয়াই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম নজর পড়িয়াছিল ফেলুর ওপর। তারক মুখার্জি নাকি স্ত্রীচরিত্রে অপরূপ রূপ দান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি সাজিবেন "মানময়ী" (বয়স ত বাড়িতেছে) আর ফেলু নীহারিকা। তাঁর উপদেশ-গুলি ফেলু শিরোধার্য করিয়াছে। এখন হইতেই নাকি-সুরে কথা কহিতে হইবে, আগে বাঁ এবং পরে ডান পা ফেলার অভ্যাস করা চাই এবং আর্শির সামনে রোজ ঝাড়া ছু'ঘণ্টা করিয়া ভাবের অভিব্যক্তির পাঁয়তারা কষা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই ভাবের অভিব্যক্তির পিরিয়ডেই আমার আবির্ভাব!

ফেলুকে অনেক বুঝাইলাম, অভিনয় করিতেছ, কর—কিন্তু প্রতিদিনকার জীবনে অভিনেতা (অভিনেত্রী) সাজিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র! আর পুরুষের পক্ষে মেয়ের রূপসজ্জা সত্যই হাস্যকর। কিন্তু ফেলু দমিবার পাত্র নয়। তারক মুখার্জ্জি তাহার মাথাটি এই কয় দিনেই চিবাইয়া খাইয়াছে। তারকদা বলিতেই ফেলু অজ্ঞান। জ্ঞানযোগ-পড়া ফেলু কি করিয়া রাতারাতি যাত্রার দলের ছোকরা বনিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। ঠিক করিলাম এবার কিছু মনস্তত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিতে হইবে।

তারকদার কীর্তি অসাধারণ। মেয়েলি হাবভাব নকল করিবার জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন বলিলেই চলে। ফেলুর মুখে তাঁর কীর্তিকলাপের কথা শুনিয়া, তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কবে নাকি বাজি ফেলিয়া তিনি "চিত্রা"র দোতালার লেডিজ সীটে বসিয়া 'উদয়ের

পথে' দেখিয়া আসিয়াছেন। বিবাহ সভায় পুরনারীদের সংগে মিশিয়া বরকে বরণও করিয়াছেন। একবার দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বেনারস যাইতেছিলেন। সামনের বেঞ্চে এক স্থূলবপু ধনী ও তাঁর স্ত্রী বসিয়াছিলেন। তারকদা একমনে মহিলাটির ভাবভঙ্গী মনের ফলকে আঁকিয়া লইতেছিলেন। কিন্তু মোটা ভদ্রলোকটি এই বেয়াড়াপনা সহ্য করিলেন না। "হাঁ করে দেখছেন কি মশাই ?" বলে'ই তারকদার গালে সজোরে এক চপেটাঘাত। থাবাটি প্যাড্-বিনিন্দিত হওয়ায় আঘাত সেরূপ গুরুতর হইল না বটে কিন্তু হয়ত অপমানের মাত্রাধিক্যবশতই গণ্ডদেশের বর্ণ-পরিবর্ত্তন ঘটিল। "আহা কর কি" বলে মহিলাটি বাধা দিতে চেষ্টা করা সত্বেও তারক মুখুয্যেকে পরের ষ্টেশনে নামিয়া কামরা বদল করিতে হইল। তার দশ বছর পরের ঘটনা। "নাট্যশ্রী" মঞ্চে 'তটিনীর বিচার' অভিনয় হইতেছে। নাম ভূমিকায় স্বনামধন্য তারক মুখার্জ্জি। "তটিনী" আসর একেবারে মাৎ করিয়া দিয়াছে। এমন স্বাভাবিক অভিনয় কেহ নাকি দেখে নাই। সখের সম্প্রদায় পেশাদারী দলকেও হার মানাইয়াছে। ঘন ঘন করতালি থামিলে বক্স হইতে এক ভদ্রলোক ঘোষণা করিলেন, তিনি "তটিনী"কে একটি স্বর্ণপদক উপহার দিতে ইচ্ছুক। অভিনয় শেষে তিনি সস্ত্রীক নটচূড়ামণির পরিচয় জানিবার জন্য নামিয়া আসিলেন। সামনা সামনি হইতেই তারকদা চিনিলেন, ইনি সেই বেনারস-যাত্রী স্থূলবপু ধনী। দশ বছর আগের ঘটনাটির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেই ভদ্রলোক অপ্রস্তুতে পড়িয়া বিনীত ভাবে মার্জনা প্রার্থনা করিলেন। বিজয়-গর্ব্বে তারক মুখার্জির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; অবশ্য পেণ্টের স্তর ভেদ করিয়া সে বর্ণ-পরিবর্ত্তন আজ চক্ষুগোচর হইল না।

ফেলুর কাছে এই কীর্তি-কাহিনী শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গেলাম। এ হেন মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভে সে যে মহাসৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছে এ কথা মানিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। ড্রেসিং টেবিলের উপর একটি 'চার্ট' পড়িয়া আছে দেখিলাম। "বিস্ময়কর বিশ্ব"ই বটে! ১। বাঁ ভ্রূ কুঁচকাইয়া ডান ভ্রূ ঈষৎ উপর দিকে তুলিলে—উপেক্ষা। ২। আড়াই মিনিট অন্তর নাক ফুলাইলে—ক্রোধ। ৩। ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক করিয়া দুই চোখ পর পর ঘুরাইলে—উন্মাদের প্রথমাবস্থা।...এইরূপ ষোল দফা।

সবগুলি লিখিয়া আপনাদের উদ্‌ভ্রান্ত করিতে চাহি না। বুঝিলাম ভাগ্যের ষোলো কলা পূর্ণ হইয়াছে। হতাশ হইয়া তক্তপোষে চিৎ হইলাম।

ফেলুর সনির্বন্ধ অনুরোধে পূজার সময় আসিতে হইল। ট্যাঁক থেকে চাঁদাও খসিল পাঁচ টাকা। তবে "রঙ্গিমা" নাট্যমঞ্চে "মানময়ী গার্লস স্কুলের" অভিনয় দেখিয়া সুদশুদ্ধ টাকা উঠিয়া আসিল। লাজুক ফেলু যখন নীহারিকার বেশে হাই-হীল্ জুতা পরিয়া ষ্টেজ শব্দিত করিয়া আসা-যাওয়া করিতে লাগিল তখন রীতিমত অবাক হইয়া গেলাম। বেলুড় মঠের শিষ্য এমনি করিয়া ফ্যাশনেবল তরুণী বনিয়া গেল, এ কি শুধু মেক্-আপের কারসাজি? কাংস্য-বিনিন্দিত কণ্ঠ, দক্ষিণপাড়ার কিশোরী-সুলভ গ্রীবা ভঙ্গিমা, চিত্রতারকার চটুলতা—সব মিলিয়া সমালোচনার ভাষায় যাকে বলে "অনবদ্য"! ধন্য তারক মুখার্জি—ধন্য তাঁর শিক্ষা প্রণালী।

মানসমোহনের লম্ফ প্রদানের পর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া

ফেলুর সে কি কান্না ! আমারও চক্ষু সজল হইয়া আসিল। "ভাবের অভিব্যক্তি"র মহলা সার্থক। অভিনয়-আঙ্গিকের ষোলো দফার জয় ! . কিন্তু শেষ দৃশ্যে ফ্যাসাদ বাধিল। শুনলাম, ফেলুর নাকি "ফীলিংস্" আসিয়া গিয়াছে। কিছুতেই কান্না রোধ করিতে পারিতেছে না। কান্নার স্রোতে পার্ট ভাসিয়া গেল। কথোপ-কথন কিছুই শুনা যাইতেছে না। কেবল ফোঁপানি আর



সারা রাত্রি প্রলাপের মধ্যে……

গোঙানি। দর্শকবৃন্দের করতালিতে কর্ণপটহ বিদীর্ণপ্রায়। স্বর্ণ-পদক, রৌপ্যপদকের প্রতিশ্রুতির যেন নীলাম চলিতে লাগিল।

গর্ব্বে আমার চৌত্রিশ ইঞ্চি ছাতিও হাঁসফাঁস করিয়া উঠিল। অভিনয় শেষে রুমালে চোখ মুছিয়া সাজঘরে ফেলুর কাছে গেলাম। ঘরে ঢুকিয়াই চক্ষুস্থির! ফেলুকে এই গরমে কম্বল মুড়ি দিয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছে। 'মানময়ী' বেশে তারকদা তার মাথার কাছে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। ব্যাপার কি? শুনলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে ফেলুর জ্বর আসিয়াছে। প্রায় জ্ঞান হারাইবার উপক্রম। প্রমাদ গণিলাম। অভিনয় করিতে আসিয়া বেচারী মারা পড়িবে না কি? তারকদা বলিলেন, এ রকম স্বাভাবিক অভিনয় সরযূবালা, মলিনাও করিতে পারে না। ফেলু একটা 'জিনিয়াস্'। সে-সব কথায় কান না দিয়া প্রাণের দায়ে ট্যাক্সি ডাকিয়া ফেলুকে লইয়া মেসে পৌঁছলাম। সারা রাত্রি প্রলাপের মধ্যে রবীন্দ্র মৈত্র অকল্পিত নীহারিকার পার্ট আবৃত্তি করিবার পর সকালের দিকে জ্বর ছাড়িল। দু'দিন পরে ফেলু সুস্থ হইলে আমি বর্দ্ধমানে ফিরিলাম।

কয়েক মাস পরের ঘটনা। আমি ও ফেলু বাসে করিয়া সিনেমা দেখিতে চলিয়াছি। ফেলুর সংগে সংগে অভিনয় দেখার বাতিকটা আমাকেও পাইয়া বসিয়াছিল। তার মেয়েলি ন্যাকামি ও ঢং গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। এ যে অভিনেতার কঠোর সাধনারই অংগ, তারকদা ও ফেলু সে কথা আমাকে মোটামুটি বুঝাইতে পারিয়াছে। তবে পিছন থেকে ফেলুর মিহি গলা শুনিয়া লেডীজ্ সীটোপবিষ্ট ভদ্রলোকেরা সসঙ্কোচে যখন আসন ছাড়িয়া উঠিতেন, তখন বড়ই লজ্জা করিত। যাহা হউক, সিনেমার কাছাকাছি বাস্ আসিতেই আমি ও ফেলু নামিবার

উপক্রম করিলাম। কিন্তু সেই ভীড় ঠেলিয়া নামা কি আমাদের "নীহারিকা"র সাধ্যে কুলায়? হঠাৎ বাসের একজন যাত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল, "একদম বাঁধকে জনানা।" জনানা না থাকিলেও এবং রসিকতাটি পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও ঘ্যাচাং করিয়া বাস থামিয়া গেল। সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতাটির মত ফেলু নামিয়া পড়িল। আমি মুখ কাঁচু মাচু করিয়া নামিয়া পিছু লইলাম।





১ম দৃশ্য—(রাজপথ)

[অফিস-ফেরৎ কেরাণীরা ভীড় ঠেলিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। অনেকদিন পরে হঠাৎ দুই বন্ধুর দেখা।]

প্রাণকৃষ্ণ—আরে, সুরেশ যে! এ্যাদ্দিন ছিলি কোথায়? একই সহরে থাকি, অথচ বছরে একবার দেখা হয় কি না সন্দেহ।

সুরেশ—ঠিকই বলেছিস্! নানা ঝঞ্ঝাটে থাকতে হয়—রবিবারেও ফুরসৎ পাই না। তা ছাড়া তোরা আবার দক্ষিণ

কল্‌কাতায় থাকিস—সে ত আর এক দেশ ; ইচ্ছে ত হয় যাবার কিন্তু কখন যাই বল্‌ ত ?

প্রা—আমাদের দিকেই চলে আয় না, কত কাল আর এঁদো গলিতে দিন কাটাবি ?

সু—সেইটেই ত আসল সমস্যা। টালা থেকে টালীগঞ্জ, বালি থেকে বালীগঞ্জ মায় বাঘমারি থেকে ঘুস্কুড়ি পর্য্যন্ত বাড়ীর তল্লাস করে হয়রাণ হয়ে গেছি, একটা ঘোড়ার আস্তাবলও যোগাড় করতে পারলুম না। আমরা একখানা ঘরে এগারোজন লোক বাস করছি—ভেবে ত্থাখ্‌ অবস্থাটা !

প্রা—এগারোজন কোত্থেকে হ'লরে? বৌদি তোকে "ডিয়োনে কুইনটুপলেট" উপহার দিয়েছেন না কি ?

সু—না ভাই, ভগবান সেই সৌভাগ্য থেকে বাঁচিয়েছেন ! কিন্তু ভারত-ভাগ্য-বিধাতার রসিকতার ফলে পাকিস্তান থেকে মামার গুষ্ঠিবর্গ এসে ঘাড়ে চেপেছেন। তাঁদের কল-কোলাহলে আমাদের দর্জ্জিপাড়ার এঁদো গলি জম্‌-জমাট হয়ে উঠেছে।

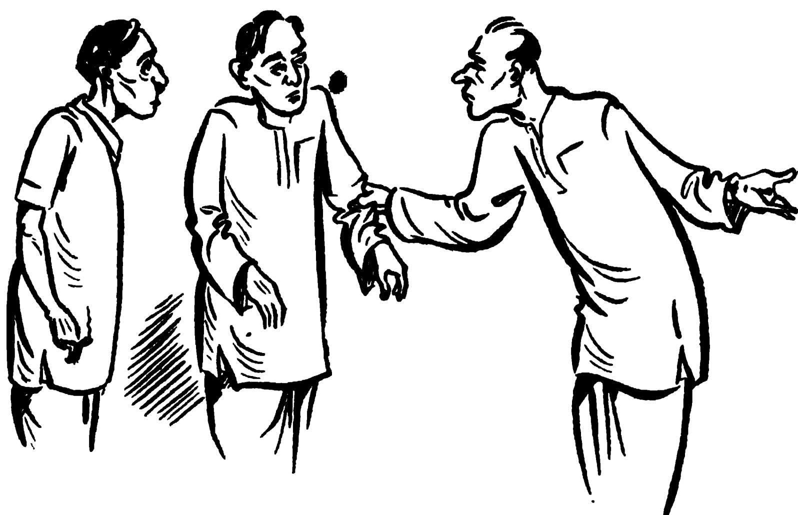
প্রা—কেন তোমার সঙ্গে ত অনেক লোকের জানাশোনা। চেষ্টাচরিত্র করেও বাড়ী যোগাড় করতে পারলে না ?

সু—চেষ্টার ত্রুটি করিনি প্রাণকেষ্ট। সেলামী, বেনামী সব কিছুতেই রাজী ছিলাম—তবু বাড়ীভাড়া-তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে টলাতে পারলুম না। তাঁর দেখা পেলে হৃৎপিণ্ড রক্ত-চরণে উপহার দিয়ে বলতাম—"দেবী, প্রসীদ ! আর কত কষ্ট দেবে এই অভাজনকে ? চেয়ে দেখ জুতো জোড়ার দিকে—অতি-পরিশ্রমে কাতর বুভুক্ষু কুক্কুরের মত তারা মুখব্যাদান করে রয়েছে।..."

(অদূরে ফুটপাথের উপর এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন। হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া সুরেশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন)—

ভদ্রলোক—মশাই, আপনাকেই খুঁজছিলাম; চলুন আমার সঙ্গে!

সু—(চমকাইয়া) এ্যাঁ? আপনাকে ত চিন্‌তে পারছি না?



মশাই, আপনাকেই খুঁজছিলাম

ভ—তা না পারেন ক্ষতি নেই, আমি আপনাকে চিনেছি। আপনিই পারবেন। (স্বগত) বেশ সুরেলা গলা আছে। একবার মিসিবাবার খপ্পরে ফেলে দিয়ে আস্‌তে পারলে বাঁচি। ২৭

জনকে নিয়ে গেলুম—২৭ জনই disqualified হয়ে গেল, বরাতে আমার ৫০০৲ টাকার চেক নেই দেখছি !

প্রা—আপনিত আচ্ছা লোক মশাই ! চেনা নেই শোনা নেই, বল্ছেন কিনা আপনার সঙ্গে যেতে। আবার বিড় বিড় করে কি সব বকছেন। পুলিশের লোক হন ত স্পষ্ট বলে দিন আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগটা কি ? ইনি সরকারী অফিসের চাকুরে—সে কথা মনে রাখবেন।

ভ – আরে না মশাই, ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? আমি বাড়ী ভাড়ার দালালি করি। ইনি বাড়ী পাচ্ছেন না বলছেন, আমার সন্ধানে খুব ভাল বাড়ী আছে ! তাই সঙ্গে যেতে বল্ছি।

সু – আপনি কি দালাল সেজে অভাগাকে ছলনা করতে এসেছেন, Sir ? রহস্য করবেন না, ভেঙ্গে বলুন ; সেই কোন্ সকালে দেড় ছটাক চালের ভাত খেয়ে বেরিয়েছি—পেটের নাড়ী-ভুঁড়িগুলো 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলে চেচাঁতে সুরু করে দিয়েছে, এখন বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচি।

ভ—বাড়ী ফিরে যাতে আরাম পান সেই ব্যবস্থাই করে দেব আপনাকে ; এগারোখানি ঘরে পরিবারের এগারোজন লোককে রেখে দেবেন, আর ফুরসৎ পেলেই ফুলের বাগানে বেড়িয়ে নেবেন।

সু—ফুলের বাগান ? আপনি দেখছি উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তি। কলকাতা শহরে গোয়াল ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না, আর আপনি ফুলের বাগানের স্বপ্ন দেখছেন ?

প্রা—আমি ভাই চললাম সুরেশ। তোমরা দুজন জমিয়েছ বেশ, এখন রাস্তায় ভীড় না জমলেই হয়।

সু—আরে দাঁড়াও প্রাণকেষ্ট। একটা রোমাঞ্চকর কিছু

ঘটবে মনে হচ্ছে। এগারোখানা ঘর। শেষকালে হয়ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। (ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া) বাড়ীওয়ালার সেলামীর বছরটা এবং আপনার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেকের ফি বাবদ কত দিতে হবে একবার শুনিয়ে দিন—কর্ণকুহর এবং হৃদয়কন্দর দুই-ই পরিতৃপ্ত হোক!

ভ—সেলামী-টেলামী লাগবে না। আমাকে একদিন হোটেলে খাইয়ে দেবেন তাহলেই হ'ল। আর বাড়ীওয়ালা ত নয়—বাড়ীওয়ালী……..রূপযৌবনসম্পন্না রমণী। একবার গেলে আর সে বাড়ী ছাড়তে চাইবেন না।

প্রা—এ রোমাঞ্চ নয় সুরেশ, একেবারে রোমান্টিক! নাঃ আজ আর বাড়ী ফেরা হ'ল না। যা থাকে কপালে, ভদ্রলোকের সঙ্গই নেওয়া যাক।

সু—মহাশয়ের নামটা কি তা ত জানা হ'ল না।

ভ—শ্রীদক্ষিণামোহন সেন।

সু—বিনা-দক্ষিণায় বাড়ীভাড়া জুটিয়ে দেন—নামটা ত আপনার মানানসই হ'ল না। তবে মোহন ঠিকই। পাঁচ মিনিটেই আমাদের মুগ্ধ করে ফেলেছেন। চলুন এবার আপনার "মোহিনী"টিকে দেখাবেন চলুন। কোন দিকে যেতে হবে?

দক্ষিণা—ইন্দ্রাণী পার্ক, টালিগঞ্জ।

সু—তা মন্দ নয়—তবে ইন্দ্র, বরুণ, বা ঐ গোছের কাউকে ধরে নিয়ে গেলেই ভাল করতেন। গরীব কেরাণীকে ইন্দ্রপুরীতে কি মানাবে?

দ—আপনি নিশ্চয়ই খুব ভাল থিয়েটার করেন। আপনার বলবার ধরণটি বেশ! (স্বগত) ইনিই মিস গুপ্তাকে খুসি করতে

পারবেন বলে মনে হচ্ছে। জয় মা কালী, এবার লাগিয়ে দাও মা।

প্রা—জীবন রঙ্গমঞ্চে নিত্য থিয়েটার লেগে আছে, দাদা। নায়কের পার্ট নিয়েই যা টানানানি। তা সুরেশের যৌবনশ্রী এখনও কিছু রয়েছে—একরকম করে চালিয়ে নিতে পারবে। আপনিও কি অভিনয় করেন না কি? থিয়েটার সম্পর্কে আপনার আগ্রহ আছে দেখছি।

দ—আমার কি আর আগ্রহ আছে মশাই? আগ্রহ সেই বাড়ীওয়ালীর।

সু—ব্যাপারটা ক্রমশই যে ঘোরাল হয়ে উঠছে, প্রাণকেষ্ট। "ব্ল্যাক মেলের" ব্যাপার নয় ত?

প্রা—আরে অত ভয় পাচ্ছ কেন? বাঘ-ভাল্লুক তো নয় যে খেয়ে ফেলবে। আর কিছু না হয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে নিশ্চয়। আমি ইন্দ্রানী পার্ক চিনি, সেখানে ভয় পাবার বিশেষ কিছু নেই। তবে বাড়ীভাড়ার ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমালে মনে হচ্ছে। ও পাড়ায় বাড়ী খালি থাকলেও I. C. S., I. P. S. ছাড়া কে যাবে? ভূতের বাড়ী নয় ত?

দ—নিজের চোখেই একবার দেখবেন চলুন না। সব সংশয় মিটে যাবে।

সু—তাই চল হে। এই যে ট্রাম বেঁধেছে! চল উঠে পড়ি। (ট্রামের টিং টীং শব্দ; "এহে পাটা একেবারে ছেঁচে দিলে।" "লেডীজ, লেডীজ—সরুন!" প্রভৃতি সোরগোল।)

* * * *

২য় দৃশ্য

ইন্দ্রানী পার্কে মিস বনবাণী গুপ্তার প্রাসাদ, পিতৃ-

মাতৃহীনা যুবতী একাকিনী থাকেন। চাকর দরওয়ান, মালী, গৃহপালিত কুকুর প্রভৃতি অবশ্য আছে—কিন্তু বনবাণীর দোসর আজিও জোটে নাই। বিরহিনী আপন মনে গান গাহিতেছিলেন—)

বনবাণী—

মোর জীবনেতে আসে নাই প্রেম
লভি নাই কভু মিলন-মালা
উষর মরুভূ পার হয়ে গেছি,
মিলেছে শুধুই দহন জ্বালা ;
প্রিয় ছিল মোর ধরণী নিঠুর,
নিকটের সাথী ছিল বহুদূর—
রাতের আঁধার নেমেছিল পথে
গগনে ছিল না আলা।

দ্বিপ্রহরের অগ্নিরাগিণী
বেজেছিল মোর প্রাণে ;
লেলিহান শিখা জ্বলে উঠেছিল
বেদনার গানে গানে ;

প্রেমের মাধুরী মিলায়েছে জানি
তবু ত গেয়েছি সেই গানখানি
কেহ কি নেবে না কণ্টক-ভরা—
শূন্য আমার ডালা ?

(গান থামলে দরওয়ান আসিয়া বনবাণীর হাতে কার্ড দিয়া বলিল—)

দরওয়ান—মাইজী, তিন বাবু বাহর্ খড়ে হ্যঁায়। ইধর বোলায়ুঁ ?

বনবাণী—হ্যাঁ, হ্যাঁ বোলাও ! (স্বগত) দিনে ৫০ বার 'মাইজী' 'মাইজী' শুন্‌লে বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে—মনে হয় বয়স বুঝি বেড়ে গেল।...দেখি দক্ষিণাবাবু এবার কাকে নিয়ে এলেন। যত সব কাট-খোট্টা লোকদের ধরে আনেন—(দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া) মনের মানুষ আর খুঁজে পেলাম না।

দ—আসুন সুরেশ বা—তার মানে বসন্তসমীরণ বাবু। এঁর নামটি ভারী কবিত্বপূর্ণ মিস্ গুপ্তা। (সুরেশ বাবুর কানে কানে) এই নামই চালাবেন, আখেরে ভাল হবে।

সু—(স্বগত) যো হুকুম—নাম কেন, চেহারা পর্য্যন্ত পালটে ফেলতে পারি—এমন অট্টালিকায় যদি থাকতে পাই।...নমস্কার মিস্ গুপ্তা।

ব—মিস্ গুপ্তা নয়। তুমি সুর করে আমায় ডেকে বলবে—"আমি তোমারি।" আমার অন্তর-মরুভূমিকে শ্যামল করে তুলতে হ'বে তোমার আহ্বানে। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে—পারবে !......আমার মনের নিভৃত কুঞ্জে সুর জাগাতে তুমিই পারবে !......আমায় ডাকো একবার—'প্রিয়তমা' বলে, বসন্তসমীরণ !

প্রা—(স্বগত) ওঃ ব্বাবাঃ ! এ যে একেবারে রাঁচির কাঁকে ! "স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রমো নু !" কলকাতা শহরে এমন আজব চীজ মিলবে না ত মিলবে কোথায় ? তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্যক্তি আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তবু লজ্জা-সরম নেই !

সু—(মিষ্টি সুরে) প্রিয়তমা ! (গলা কাঁপিয়া গেল ; গলা ঝাড়িয়া) হে প্রিয়-বান্ধবী, তুমি আমারি !

ব—বসন্তসমীরণ, তোমার ঐ কবি-কণ্ঠে গান গেয়ে ওঠো। আমার নাম বনবাণী; মুদিত পুষ্পকলিগুলির অন্তরদ্বার তুমি মুক্ত করে দাও। তুমি—

সু—(স্বগত) এখন কামরাগুলির দ্বার মুক্ত করে আমার হাতে চাবিকাঠি তুলে দাও দেখি। গিন্নীকে কিছু দিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দি—এ সব দেখলে তিনি ত কুরুক্ষেত্র বাধাতেন। আপাততঃ মামাদের এখানে এনে ফেলে আমার ঘাড় ত হালাকা করি। অফিস থেকে ফিরে রোজ দেখছি যাত্রার মহলা দিতে হবে। তাই সই। রাত্তিরটা ত পা ছড়িয়ে ঘুমোতে পারব।

প্রা—ওহে সু—খুড়ি—বসন্ত বাবু। তোমার বরাৎ ত ফিরে গেল। আমাকে এখন ছেড়ে দাও—বাইরের খোলা হাওয়ায় গিয়ে পেট-ভরে হেসে বাঁচি। এখানে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় দেখে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। চলুন দক্ষিণাবাবু—কোন্ হোটেলে যাবেন ?

সু—(চাপা গলায়) দেখো প্রাণকেষ্ট, ব্যাপারটা ফাঁস কোরো না কারু কাছে। তাহলে কেলেঙ্কারীর সীমা থাকবে না। বনবাণীর পাল্লায় পড়ে শেষকালে না বনবাসে যেতে হয় !

দ—আসুন, প্রাণকৃষ্ণ বাবু—এঁদের একটু নিরিবিলি থাকতে দিন।

প্রা—অভিনয় করতে গিয়ে সত্যি সত্যি 'love at first sight' না হয়। সুন্দরী যুবতী দেখে বন্ধুবরের মন মজে গেলে তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বৌদির কি অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখুন দক্ষিণাবাবু। এর চেয়ে ১০০০৲ টাকা সেলামী দেওয়াও ত ছিল ভাল।

দ—আপনার কি হিংসে হচ্ছে নাকি প্রাণকৃষ্ণবাবু? আপনার বন্ধুটি ফেল করলে, আপনিও একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ৫০০৲ র কমিশনটা একবার আদায় করতে পারলে কোন শালা আর এ রকম বাড়ীর দালালী করে। মেয়েমানুষের পাল্লায় ত পড়েন নি—একেবারে নাজেহাল হয়ে গেলুম।
(বনবাণী গুন্‌গুন্ করিয়া গান ভাঁজিতেছিলেন)

প্রা—চলুন, এবার বোধহয় মিলন-সঙ্গীত আরম্ভ হবে। ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস! (দু'জন নিষ্ক্রান্ত)

৩য় দৃশ্য

[এক সপ্তাহ পরের কথা। মামারা ইন্দ্রাণী পার্কে আসিয়াছেন। এক-তলার ১১খানি ঘর তাঁদের দখলে। তাঁদের দোতালায় ওঠা বারণ, কিন্তু ছেলেপুলেরা মাঝে মাঝে উঁকি মেরে বনবাণী আর বসন্তসমীরণের প্রেমাভিনয় দেখে ফেলে। সুরেশ তার মামাকে বুঝাইয়াছে যে উপরে ফিল্ম কোম্পানীর রিহার্সাল চলিতেছে। সে-ও একটি পার্ট পাইয়াছে, তা'তে মোটা টাকা পাওনা। বাগান-বাড়ীতে থাকিতে পাইয়া সেকেলে মামা একেলে চাল-চলনকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু মামীর মনে খট্‌কা বাঁধিয়াছে। তাঁর দুটি ট্যারা চোখে ধূলি দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়।]

মামী—যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড! উনি ত বড় বাড়ী দেখে ভুলে গেলেন। আমার হয়েছে জ্বালা। দিনরাত প্যান্ প্যানানি, ঘ্যান্-ঘ্যানানি, গান, থিয়েটার—এমন বেলেল্লাপণা জীবনে দেখিনি বাপু। ভদ্রলোকের মেয়ে, তোর ইচ্ছে হয় বিয়ে-থা কর, টাকার ত অভাব নেই—এমন করে একটা পুরুষ মানুষের মাথাটা চিবিয়ে খাবার দরকার কি? বৌ নয় দু'দিন বাপের বাড়ী গেছে, সে ফিরে এসে এই সব দেখলে আমাকেই ত দুষবে। পারি না

বাপু ঝঞ্ঝাট পোহাতে! ওরে পুঁটি, তোর বাবাকে একবার ডেকে আন্ ত। আশ্চর্য্য মানুষ। বেলফুল কানে গুঁজে বাগানে বেড়াচ্ছেন দু'ঘণ্টা ধরে। দু'দিন বাদে যে এরা তাড়িয়ে দেবে সে খেয়াল নেই। কথায় বলে—"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ"!

মামা—কি গো, আবার কি হ'ল? একটু বেড়িয়ে শরীরটা ঝরঝরে করে নিচ্ছি, তাও তোমাদের সয় না!

মামী—চোখ দুটো খুলে রেখে যত খুশি বেড়াতে পার বেড়াও। চোখ-কান বুজে থাকলে আখেরে পস্তাতে হ'বে বলে রাখছি।

মামা—কেন, চোখ ত খোলাই রয়েছে। এ বাড়ীর হাওয়া লেগে তোমার গায়ে গত্তি লেগেছে তাও দেখতে পাচ্ছি। নবদুর্ব্বাদলশ্যাম বর্ণে চেক্‌নাই দেখা দিয়েছে।

মামী—আ মর্ মিন্সে! ছ' ছেলের বাপ, মাথার চুল সব সাদা হয়ে এল, বুড়ো বয়সে ঢং করছেন। তুমিও যাত্রার দলে পার্ট পেয়েছ না কি? দু'দিন বাদে ছেলেপুলে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে সেটা ভেবে দেখেছ? তখন পোড়া মুখে ছড়া কাট্‌লে চল্‌বে কি?

মামা—আ-হা, আস্তে আস্তে বল না। এটা টালিগঞ্জ,—দর্জ্জিপাড়ায় ও সব ভাষা মানাত, এখানে সম্‌ঝে চল্‌তে হবে। তোমার সন্দেহের মন, কু-টাই তোমার নজরে আগে পড়ে। এদিকে এত বড় বাড়ীর যে ভাড়া লাগবে না, সে খবরটা কি রাখ? সুরেশ বলছিল—এঁদের অনেক টাকা, সামান্য বাড়ী ভাড়া নিয়ে আর হাত ময়লা করতে চান না। এ ভগবানের দান, গিন্নী এটা জেনে রেখো।

মামী—শুন্‌লে একবার কথাটা! বিনিপয়সায় তোমাকে

এই রাজ-প্রাসাদ দিয়েছে, আর এ সবের ভেতরে কোনো গোলমাল নেই—এই কথাটা তুমি মেনে নিলে? ধন্যি পুরুষ মানুষের বুদ্ধি! নাঃ, একটা কেলেঙ্কারী না বাধিয়ে তোমরা ছাড়বে না। এর চেয়ে আমার পাকিস্তানই ছিল ভাল। শহরে ডাইনীর পাল্লায় পড়ে আমাদের প্রাণ, মান সবই যাবে দেখছি। আমাকে তুমি দর্জ্জিপাড়াতেই পাঠিয়ে দাও বাপু—বাগান-বাড়ীতে থাকবার সাধ আমার মিটে গেছে। কাল রাত্রে বাব্‌লু স্বচক্ষে দেখে এসেছে, ওপরের ঐ রং-মাখা ছুঁড়িটা ভাগ্‌নের গলা জড়িয়ে ধরে কি সব বল্‌ছিল! ইচ্ছে করে এক-বার ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে গিয়ে পোড়ারমুখীর মুখের ওপর দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি। নামের আবার ঢং দেখ না, বনবাণী—বাপের জন্মে এমন নাম শুনিনি বাপু।

মামা—আরে চুপ চুপ! তুমি সর্ব্বনাশ করবে দেখছি। কলকাতা শহরে একখানি চালাঘর জোটে না—এখানে হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচ্‌ছ; আবার আশ্রয়দাত্রীর বিরুদ্ধেই তোমার নালিশ। ঐ যে সুরেশ আসছে। ওর সামনে কিছু বোল না।

সু—আজ আমাদের গঙ্গার ওপর ষ্টিমারে একটা শূটিং আছে; রাত্রে ফেরা হবে না। তোমরাই বাড়ীতে থাকবে; একটু সাবধানে থেকো। আমার বড্ড তাড়াতাড়ি—চল্লাম।

মামী—এমন ভাল ছেলেটা একেবারে বয়ে গেল! রাক্ষুসী ওর হাড় মাস চিবিয়ে খাবে দেখছি।

মামা—আবার সুরু করলে। শাস্ত্রে বলেছে "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"। ওরা থাকবে না, বেশ ওপরে বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখে নেওয়া যাবে।

মামী—আমি আজই বাব্‌লু, পুঁটি, গণশা, বুঁচি, ফট্‌কে আর

খুকীকে নিয়ে দক্ষিণপাড়ায় চললুম। থাক তুমি এই ডাইনীর বাড়ীতে !

৪র্থ দৃশ্য

[গঙ্গাবক্ষে ষ্টিমারলঞ্চে বনবাণী ও বসন্তসমীরণ প্রেমালাপে রত।]

বন—আমার শূন্য জীবনে তুমি রঙে-পরিপূর্ণ বসন্তের ডালি নিয়ে এসেছ সমীরণ ! আমার মনের বাগান বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-স্তবকে ভরে উঠেছে।

বসন্ত—(স্বগত) এদিকে আমার সাজান বাগান যে "শুকিয়ে গেল"। ট্যারা চোখে মামী সব দেখে ফেলেচে—আবার তাঁর দুটি ক্ষুদে গুপ্তচর। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। একটা মৎলব ঠাউরেছি রেহাই পাবার—দেখি।…বাণী তুমি আমারি, যুগে যুগে শত জন্মে, তুমি আমারি। সত্যযুগে তোমায় আমায় হিমালয়ের শীতল ক্রোড়ে প্রেমের খেলা খেলেছি। ত্রেতাযুগে সরযূ নদীর তীরে কুটির বেঁধেছিলাম তোমারই জন্যে। আর দ্বাপর যুগে বাঁশের বাঁশি হাতে করে বনে বনে তোমার পিছনে ছুটেছিল সে কে ? এই বসন্তসমীরণ। হৃৎপিণ্ডের ওপর রক্তরেখায় কার নাম লেখা রয়েছে ? সে যে তোমারি !

বন—বল, বল, আমার শ্রবণে অমৃত বর্ষণ কর। ভূলোক, দ্যুলোক সব লুপ্ত হয়ে যাক প্রেমের প্লাবনে। তোমার সংস্পর্শে এসে আজ আমি নারী, আমি মহীয়সী হয়ে উঠেছি। তুমি আমায় প্রেমভরে ডাকো—আমি চোখ বুঁজে স্বপ্নের ভেলা ভাসিয়ে দিই !

বসন্ত—(স্বগত) ভালোই হয়েছে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকো বাছা। জামা জুতো খুলে ফেলি। এইগুলোই যা লোকসান হয়ে গেল।……

(সুরে)

নয়নে তোমার কি কথা লুকানো আছে
মুদে থাক আঁখি, বুঝে ফেলি বুঝি পাছে।

গান কর বনবাণী তোমার সুরের অতল তলে আমি তলিয়ে যাই! [বসন্ত ষ্টিমার থেকে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিল। জলের শব্দ। বিহ্বল বনবাণী চোখ মেলে দেখল প্রিয়তম নদীগর্ভে একবার উঠিতেছে একবার ডুবিতেছে]।

বন - (চীৎকার করিয়া) — হায়, হায় আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল! ফিরে এস বসন্ত, ফিরে এস, অমি তোমারি, আমি তোমারি!

বসন্ত - (দূর হইতে) শৈবলিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়, তা না পারো—প্রতীক্ষা করে থাক, আগামী জন্মে আমি ইন্দ্রাণী পার্কের গৃহস্বামী হয়ে জন্মাব। এ জন্মের মত বিদায়! বিদায়!

(স্বগত) ডুব সাঁতার দিয়ে একবার পারে উঠি। তারপর সোজা শ্বশুরবাড়ী। মামা-মামীর বোঝা ত ঘাড় থেকে নেমেছে। এখন গিন্নী কিছু টের না পেয়ে থাকলেই বাঁচি।

বন—ফিরে এস বসন্তসমীরণ, ফিরে এস। তুমি আমারি, তুমি আমারি।



স্বয়ংবর



১ম দৃশ্য।

[পটলডাঙ্গার একটা মেস। সুশোভন এবং তাঁহার বন্ধু প্রবীর ও কয়েকটি তরুণ সেখানে থাকে। আজ সন্ধ্যায় দেশ থেকে সুশোভনের কাকা এসে পৌঁছবেন; বালিগঞ্জে তার জন্য পাত্রী দেখ্‌তে যাবার কথা। সেদিন রবিবার। দুপুরবেলা মেসে বন্ধুদের মধ্যে তাস খেলার সঙ্গে আলোচনা চল্‌ছে।]

প্রবীর—কিরে সুশোভন, খেল্‌তে খেল্‌তে তুই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিস্ কেন? No Trumpএর Call—তোর সে খেয়ালই নেই! এখনও ত পাত্রীকে চোখে দেখিস্ নি, এর মধ্যেই এত?

বলাই—(সুরে) "তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগে—বেদন জাগে গো; আমি না চিনিতেই ভাল বেসেছি!"

সুশোভন—তোদের খালি ইয়ার্কি! কাকাবাবু আজ্‌কে দেশ থেকে এসে প্রবীরকে সঙ্গে নিয়েই ত বালিগঞ্জে পাত্রী

দেখ্‌তে যাবেন। আমি ত আর যাব না, আমায় খেপাচ্ছিস্‌ কেন ?

প্র—দুঃখ করিস্‌ নি সুশোভন! কাকাবাবুকে বলে কয়ে তোকেই তাঁর সঙ্গে আজ পাঠাব ; নইলে দেখ্‌ছি তুই হার্টফেল করবি। বৌ-এর কথা ভেবে ভেবে খেলাটা তুই মাটি করে দিলি হতভাগা! (পিওনের প্রবেশ)

পি—বাবু, চিঠ্‌ঠি হ্যায়! "বলাই ব্যানার্জ্জি, সুকুমার হালদার সুশোভন ঘোষ"।

সু—আমার চিঠি? দেখি, দেখি! (পড়তে পড়তে মুখ আঁধার হয়ে উঠ্‌ল)

ব—কিরে, অমন মুখ কালো করে রইলি কেন? কোন দুঃসংবাদ নাকি ?

সু—না—হ্যাঁ! (আমৃতা আমৃতা করতে লাগ্‌ল) [প্রবীর চিঠিটা কেড়ে নিয়ে পড়লে]

প্র—ওঃ, এই কথা! কাকাবাবু বাতের ব্যথায় ভুগ্‌ছেন, আজ আসতে পারবেন না। এইতেই তোর মন ভার হয়ে গেল? আচ্ছা বৌ-পাগ্‌লা হয়েছিস্‌ দেখ্‌ছি!

সু—আরে তা নয়! ভদ্রলোকদের বলা আছে আজ সন্ধ্যায় মেয়ে দেখতে যাওয়া হবে। তাঁরা কি মনে কর্‌বেন? ভাববেন—এদের কথার ঠিক নেই!

ব—এবং যাঁর কথার ঠিক নেই তাঁর ভাইপোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কখনই উচিত হবে না—কি বল ?

সু—আবার ঠাট্টা ? আমি কি অন্যায়টা বলেছি ?

প্র—না, আপনি খুব ন্যায় কথা বলেছেন। আজ

সন্ধ্যাতেই আমরা বালিগঞ্জ যাব; কোনো কথার খেলাপ হবে না।

সু—তা কেমন করে হ'বে ?

প্র—'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য!' তোর কাকাকে তাঁরা কি কখন দেখেছেন ?

সু—না। ঘটক আজকের পাত্রী দেখতে যাবার ব্যবস্থা করেছিল।

প্র—ব্যস্! আর কোন ভাবনা নেই। তুই চট্‌পট্ গা ধুয়ে সেজেগুজে নে দেখি! বলাই, গত বছর পূজোর সময় মেক্-আপের জন্যে আমরা যে ক্রেপের বাক্স আনিয়েছিলুম সেটা তোর কাছে আছে না ?

ব—আছে বলেই ত মনে হচ্ছে—দেখি একবার খুঁজে!

সু—প্রবীর, তোর মতলব ত কিছু বুঝ্‌তে পারছি না!

প্র—একটু পরেই পারবি। ভয় নেই ডাকাত সেজে তোর ভাবী বৌকে নিয়ে আমি পালাব না।

[আয়নার সাম্‌নে প্রবীর বৃদ্ধের রূপসজ্জা করছে। সুশোভন সেজেগুজে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে।]

প্র—এবার কাকাবাবু বলে আমায় ডাক্ দেখি!

সু—যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড। তুই এ বেশে সেখানে গেলে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবি। আমি যাচ্ছি না, বাবা। শেষে তোর জন্যে কি মার খেয়ে বাড়ী ফিরতে হবে ?

প্র—কোনো ভয় নেই বৎস! (বৃদ্ধের স্বরানুকরণে) তুমি প্রবীর, পাত্রের বন্ধু—তোমাকে মারে কে ?

২য় দৃশ্য।

[বালিগঞ্জের ছোটখাট একটি প্রাসাদের সাম্‌নে একখানি ট্যাক্সি এসে থাম্‌ল। কাকাবাবুবেশী প্রবীর ও প্রবীরবেশী সুশোভন নাম্‌ল। বারান্দা থেকে পাত্রী মুকুলিকা ওদের আস্‌তে দেখে ছুটে ঘরে গিয়ে বাবাকে বল্‌লে—]

মু—বাবা, কারা যেন আমাদের বাড়ী আসছেন!

কেশববাবু। তাই না কি মা? একটু আগে যে চিঠি পেলাম ওঁরা আজ আসতে পারবেন না লিখেছেন! পাত্রের কাকার আস্‌বার কথা ছিল, তাঁর বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। দেখি, এরা আবার কোথেকে এলেন!

[ইতিমধ্যে চাকর ওদের বৈঠকখানায় বসিয়েছে। প্রবীর ফিস্‌ফিস্ করে সুশোভনকে বল্‌লে—]

প্র—বোকামি করে সব মাটি করিস্ নি যেন!

সু—আরে না, না—আমাকে আর শেখাতে হবে না। তুমি এখন ধরা না পড়লেই হয়। যা দাড়ির বহর বানিয়েছ—

প্র—চুপ্। মেয়ের বাপ বোধ হয় আস্‌ছেন! (কেশব বাবু ঢুকতেই এরা উঠে দাঁড়াল) [অভিবাদন প্রতি-অভিবাদনের পর কেশববাবু বল্‌লেন—]

কে—আপনার নাম কি উমাশঙ্কর বাবু? আপনি বনগাঁ থেকে—

প্র—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর এ ছেলেটি আমার ভাইপোর বন্ধু—প্রবীর!

কে—একটু আগে আপনার চিঠি পেলাম, আপনি বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন—

প্র—(স্বগত) সেরেছে! আজ্ঞে, হ্যাঁ—তা—আপনাদের আস্‌ব বলে কথা দিয়েছি, আর সকালের দিকে ব্যথাটাও একটু কম্‌ল, ভাব্‌লুম বেরিয়ে পড়ি—শুভস্য শীঘ্রং।

কে—বেশ করেছেন, এসেছেন। তবে হাঁটাহাঁটিতে আপনার বাতের ব্যথাটা না বেড়ে যায়।

প্র—না, না—ও আমি সাম্‌লে নেব। শুনেছি, আপনার মেয়ে সুন্দরী। মায়ের মুখখানি একবার দেখ্‌লেই আমার সব কষ্ট দূরে যাবে। আর দেরী করবেন না। আপনার মেয়েকে এখানেই নিয়ে আস্থন। ওপরে উঠ্‌লে ব্যথাটা আবার বাড়বে।

কে—হ্যাঁ, এখানেই নিয়ে আস্‌ছি। মেয়ে আমার শুধু রূপে নয়, গুণেও আপনাদের মুগ্ধ করবে। আমি বাপ বলে গর্ব্ব করছি না, আপনারা যাচাই করে নেবেন।

প্র—বিলক্ষণ! আপনার মত সদাশয় ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো ত আমাদের পক্ষে ভাগ্যের কথা। (কেশববাবু ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর স্ত্রী হেমনলিনী আড়ালে দাঁড়িয়ে কথোপকথন শুন্‌ছিলেন!)

কে—যাও দাঁড়িয়ে থেক না, মেয়েকে তাড়াতাড়ি সাজিয়ে দাও। ওদের আবার কলকাতার বাইরে যেতে হ'বে।

হে—বুড়োর বাত-টাত সব বাজে কথা। হট্‌ করে এসে বিনা সাজানোতে মেয়ে দেখ্‌বে—তাই এই চালাকি করেছে। আমার মেয়েকে যে সাজানোর দরকারই হবে না—তা'ত ওরা জানে না। স্বচক্ষেই দেখে যাক্‌।...ওই ছোকরাটি কে গো? বেশ দেখ্‌তে। বর নিজেই এসেছে নাকি?

কে—না গো না। ও বরের বন্ধু।

হে—(হতাশ সুরে) বরের বন্ধু?

[কেশববাবু মুকুলিকাকে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। সে করজোড়ে নমস্কার জানাল। চাকর ট্রে-তে করে চা-খাবার দিয়ে গেল]

প্র—বস মা বস। আহা, মুখখানি দুর্গা-প্রিতিমের মত। (মুকুলিকার সলজ্জ হাসি)

সু—বসুন, বসুন। (চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌ল)

কে—আপনি বসুন। ও এদিকে বস্‌ছে।

সু—আমি আপনার ছেলের মত, আমাকে 'আপনি' বল্‌বেন না !

কে- বেশ, বেশ। আজকালকার ছেলেদের মুখে এ রকম বিনয়-নম্র, কথা বড় একটা শুনতে পাওয়া যায় না। তোমার নামটা কি যেন, বেশ—

সু - সু—

প্র—প্রবীর দাশগুপ্ত। আমার ভাইপো সুশোভনের বাল্য-বন্ধু। এর যেমন সুন্দর কথা দেখ্‌ছেন, সুশোভনেরও তেম্‌নি।

কে—বড় সুখী হলুম শুনে। পণ্ডিতেরা বলে গেছেন, 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং'। আচ্ছা, আমি ভেতরে যাই, আপনারা আমার মা'কে যা জিগেস করবার হয় করুন। আমি ওকে ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়েছি। আশা করি আমার মেয়ের কথাবার্তায় আপনারা সন্তুষ্টই হ'বেন। (নিক্রান্ত)

সু—আপনার নামটা বলবেন ?

মু—কেন বল্‌ব না ? আমার নাম মুকুলিকা বসু।

প্র—বাঃ, বেশ চট্‌পটে মেয়ে তুমি। আমার এই রকমই পছন্দ। তুমি নিশ্চয়ই গান জান মা ?

মু—একটু আধটু জানি।

সু—তা'হলে করুন না একখানা!

চণ্ডী চাকর—হারমোনিয়ম এনে দেব দিদিমনি?

মু—হাঁ, হাঁ নিয়ে এস।

মু—আপনাদের চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নিন্।

প্র—ঠিক বলেছ মা, ঠিক বলেছ। বুড়ো মানুষ খেয়ালই ছিল না। তোমার কথাগুলি ভারী মিষ্টি। (দু'জনে খাবার ও চা খেতে লাগ্‌ল, গানও সুরু হ'ল।)

মু— গানের মালা তোমার গলায় দুলিয়ে দেব প্রিয়,
তারি মাঝে প্রাণের গোপন বার্ত্তা বুঝে নিও।
রইবো যখন অনেক দুরে
স্মরণ কোরো গানের সুরে,
মিলন-স্মৃতি বিরহেরে করবে রমণীয়।
তুমিও গেঁথো মালা গানের ফুলে—
আমার গলে দিও, যখন আস্‌বো প্রাণের কূলে;
নবীন সুরের বিধুর সুরভিতে
হঠাৎ-খুসি জাগবে আমার চিতে,
আপন হাতে ছন্দ-দোলায় দুলিয়ে তারে দিও॥

সু—(চায়ের পেয়ালা শেষ করে) চমৎকার!

মু—কোন্‌টা চমৎকার?

সু—তার মানে—হ্যাঁ—এই চা-টা ভারি চমৎকার!

প্র—ঠিক বলেছ সু—প্রবীর! যেমন গানের সুর তেম্‌নি চায়ের স্বাদ—দুই-ই অপূর্ব্ব!

সু—কোন্ কোম্পানীর চা বলুন ত?

(কেশববাবুর প্রবেশ

কে—কিসের আলোচনা করছিস্ মা তোরা ?

মু—চায়ের, বাবা !

কে—চায়ের ? ও ! চা-টা সত্যিই ভালো। সকলেই খেয়ে প্রশংসা করছেন।

প্র—কোম্পানীর ঠিকানাটা একটু লিখে দেবেন ত ! এক কাপ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাতের ব্যথাটা কমে গেল মনে হচ্ছে।

কে—মুকু, যা মা—এবার তুই ভেতরে যা !

সু—তার চেয়ে বসুন না, আর একখানা গান—

মু—তার চেয়ে বরং আর এক কাপ চা নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

প্র—বড় সুন্দর মেয়ে আপনার। আমি পাকা কথাই দিয়ে গেলাম। এখন আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন ততই মঙ্গল।

কে—আমি আপনাদের কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ। আপনার ভাইপোকে আমরা কবে দেখ্তে যাব বলুন !

সু—তার আর দরকার কি ? আমি—

প্র—(বাধা দিয়ে) হ্যাঁ, প্রবীর ঠিকই বলেছে, আপনাদের পাত্র দেখার দরকার আছে বই কি ! তবে আমিও গর্ব্ব করে বল্তে পারি, সুশোভনকে আপনারা একবার যদি দেখেন তাহলেই মুগ্ধ হবেন। কালই দেখার ব্যবস্থা করুন না !

কে—বেশ ত !…নমস্কার !

প্র—নমস্কার ! নমস্কার ! সুশোভন কেশববাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

কে—বাঃ, বেশ ছেলে তুমি। তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে! তোমার বন্ধুটিকে কাল দেখ্‌তে যাব, তুমিও থেক—কেমন?

৩য় দৃশ্য।

[বিবাহের রাত্রি। শানাই বাজ্‌ছে। বাসরঘরে বর-বধূ সুশোভন-মুকুলিকাকে ঘিরে মেয়ের দল হাসি হল্লা করছে!]

একটি মেয়ে—অনেক রাত হল। বড় ঘুম পাচ্ছে সুশোভনবাবু, চল্‌লুম।

সু—আমারও ঘুম পাচ্ছে!

২য় মেয়ে—তাই নাকি? তাহলে এক কাপ চা নিয়ে আসি জামাইবাবুর ঘুমটা ছেড়ে যাবে।

১মা—না রে তোরা সব চলে আয়, ওরা নিরিবিলিতে একটু ঘুমোক্! (নিষ্ক্রান্ত)

সু—কি গা বধূ, চুপ করে রইলে যে?

মু—ভাব্‌ছি, গান শুনিয়ে তোমাকে পেলাম, না—চায়ের জোরে?

সু—(উচ্চ হাস্য) ও দুটোর জোরই সমান—কি বল?

মু—তুমি যে স্বয়ং 'বর' তা আমি প্রথম দিন মোটেই বুঝ্‌তে পারিনি।

সু—আর, তুমি যে সেদিনই স্বয়ংবরা হয়েছিলে তা কি আমি বুঝতে পেরেছিলাম? (দূরে শানাইয়ের শব্দ)





আত্মহত্যা

গৃহিণীর সহিত কলহ বাধিল অকারণেই। সংবাদ-পত্র পড়িতেছিলাম। পিছন হইতে ডান কানের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া প্রাক্-পরিণয়সুলভ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “চল না, এবার পূজোর ছুটীতে কোথাও যাওয়া যাক্। ক’ বছর ত বেরোনই হয় নি।” বুঝিলাম, রেলওয়ে-বিজ্ঞাপিত ঘন কৃষ্ণ-বর্ণের অক্ষরগুলি তাঁর চোখে পড়িয়াছে—“ভ্রমণ কমাও”। স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, অতএব উল্টো পথেই চলিবে। বুঝাইলাম, ট্রেণের ভিড় যথাপূর্বং, অফিসে ছুটির দরখাস্ত দিলে চাকুরী যাইবার সম্ভাবনা, ইত্যাদি। নিরুপায় হইয়া মোক্ষম অস্ত্র ছাড়িলাম—“বেড়ানোর টাকায় একখানা ঢাকাই শাড়ী কেনো, নিরু! গত বছর পূজোর টানাটানিতে তোমার ভাল কাপড়

জোটেনি। কী হবে রেল কোম্পানি আর হোটেল-ওয়ালাকে পয়সা দিয়ে ?" কিন্তু ভবী ভুলিল না। গৃহিণীর আহার ও আমার নিদ্রা পরিত্যাগের উপক্রম হইল। শেষে রফা করিলাম— বাগনানে মামার বাড়ীই যাওয়া যাক্। কাছে-পিঠে, পল্লী বাংলার শারদ-সৌন্দর্য্য দেখা যাইবে, তা-ছাড়া অনেকদিন পরে যাওয়ায় মামার বাড়ীতে আদর-আপ্যায়নের সম্ভাবনাও বড় কম নয়।

বৈজ্ঞানিক সংযমের ফলে লটবহরের বালাই ছিল না। মামার আকর্ণবিস্তৃত হাসি দেখিয়া বুঝিলাম, খুশী হইয়াছেন। হাজার হ'ক রক্তের টান ত ! কিন্তু মামীর পঞ্চমসংখ্যাকৃতি মুখমণ্ডলের পরিস্ফীতি দেখিয়া প্রমাদ গণিলাম। যুদ্ধ বন্ধ হইলে কী হইবে —যুদ্ধের বাজার ত ঠিকই আছে। নিরু অর্থাৎ নিরুপমা আড়ালে চাপা গলায় ঝংকার দিয়া কহিল, "তখনই বলেছিলুম আত্মীয়স্বজনের বাড়ী আসতে নেই—চল দার্জ্জিলিং কিম্বা পুরীতে। তা ত শুন্‌লে না। এখন দেখ পল্লীবাংলার শোভা ! তোমার মামী ত' বেঁকা মুখ বেঁকিয়েই আছেন। এখানে আমাদের টিক্‌তে দেবে মনে করেছ ?" মনে করিতেছিলাম অন্য কথা ! গৃহিণীর টিকিতে পারার ক্ষমতা কতখানি তা ত' জানি, ঝগড়া বাধাইলেই হইল। তার পরই পল্লীগ্রামে টাট্‌কা মৎস্য ও নারিকেল নাড়ু খাওয়ার সখ মিটিয়া যাইবে।

কিন্তু ঘটিল অন্যরূপ। মামীর সহিত ঝগড়া বাধানো নিরুপমার

সাহসে কুলাইল না। দু'দিন না যাইতে যাইতেই গৃহিণীর মুখ মামীর মতই হাঁড়িপানা হইয়া উঠিল। আক্ষেপ ও বিক্ষেপের জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। এখানে না আসিয়া পূজার সময় সিনেমা দেখিলে কাজ হইত। বেড়াইতে বাহির হইলেই মশকের ঝাঁক সাদর অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসে, পুকুরে কি পাঁকের গন্ধ। মাতুল-সন্তান নেপো একপাটি চপ্পল কোথায় যে সরাইয়াছে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কান ও প্রাণ ঝালা-পালা হইয়া উঠিল। কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের তারিখ কতখানি আগাইয়া আনা যায় তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; ঠিক করিলাম, এ কয়দিন গৃহিণীকে গরম গরম চালভাজার লোভ দেখাইয়া শান্ত রাখিতে হইবে। পল্লীগ্রামে আসিয়া ঐ একটি জিনিষই নিরুপমার মনে ধরিয়াছে। কলিকাতায় চাল পাওয়াই দুষ্কর—ত চালভাজা।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা প্রলয় বাধিবার উপক্রম। রোরুদ্যমানা সহধর্ম্মিনী ছুটিয়া আসিয়া জানাইলেন, মামী নাকি দুধ দুহিবার সময় নিরুকে গরুর পিছনের ঠ্যাং দুটি ধরিতে বলিয়াছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধরিবার পর গোমাতা ইচ্ছাপূর্ব্বক পদদ্বয় চালনা করিয়া শহরবাসিনীকে ঈষৎ ভৎর্সনা করিয়াছেন। ফলে কোমরে ব্যথা ও মনে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। এইক্ষণেই পল্লী ছাড়িয়া কলিকাতা ফিরিতে হইবে—নিজালয়ে নয়, একেবারে পিত্রালয়ে। প্রমাদ গণিলাম। রাত্রে ফিরিবার ট্রেণ আছে বটে, কিন্তু আজই মামা পুকুর হইতে দুটি দশ সেরী কাতলা তুলাইয়াছেন। সাড়ে তিন টাকা দরের বরফে ভিজানো টুক্‌রা

খাওয়া জিভ সুস্বাদু মৎস্যের প্রতীক্ষায় লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল—গৃহিণীর মানভঞ্জনের প্রতি দৃকপাত করিলাম না। নিরুপমা শাসাইল, এর সমুচিত শাস্তি পাইতে হইবে। শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা না থাকায় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলাম।

রাত্রে ভূরিভোজন সারিবার পর শুনিলাম নিরুপমা বলিয়াছে —তাহার জ্বর, কিছুই খাইবে না। বুঝিলাম, ভাল ব্যাপার নয়। তার এই একগুঁয়েমির জন্য মনে মনে বিরক্ত বোধ করিলাম। মামার বাড়ী আসিয়া প্রকাশ্যভাবে দাম্পত্য কলহ না চালানই যুক্তিযুক্ত। থাক না-খাইয়া, আমার কলাটি। কথায় বলে না, "অভিমানীর দুখ!" গরুতে লাথি মারিল, অতএব পল্লী ছাড়িয়া শহরে ফিরিতে হইবে। ধন্যি বাঙালী মেয়ের মন। সিনেমাতেই শুধু "শহর থেকে দূরে"র প্রতি আসক্তি। মরুক্‌গে যাক্!

তবু মন কেমন করিতেছিল। এমন টাটকা মাছের কালিয়া নিরুপমা খাইতে পাইবে না। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম জ্বরের চিহ্ন মাত্র নাই। অনুনয় বিনয়ের প্রত্যুত্তরে একবার শুধু ফোঁস করিয়া উঠিলেন—বুঝিলাম, কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তা বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। কালবিলম্ব না করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কি এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। উদরে

মীনমুণ্ড গজ্‌গজ্‌ করিতেছিল—ঘুম হইবে কি করিয়া? মান ভাঙাইবার আশায় কোমল কণ্ঠে ডাকিলাম, "নিরু"। সাড়া নাই। ক্ষুধার জ্বালায় জ্বর আসিলেও আসিতে পারে ভাবিয়া গাত্রতাপ অনুভব করিতে গিয়া দেখিলাম—শয্যা শূন্য। কি সর্ব্বনাশ! রাগের মাথায় নিরুপমা না করিতে পারে এমন কাজ নাই। স্তিমিত-আলো হ্যারিকেনটি লইয়া যায় নাই দেখিয়া আশংকা বাড়িতে লাগিল। বেড়াইতে আসিয়া একটা কেলেঙ্কারী বাধিবার উপক্রম দেখিতেছি। দাওয়া, আঙিনা, গোয়ালঘর সব খুঁজিলাম—কোথাও নাই। হঠাৎ চোখে পড়িল—খিড়কির দরজা খোলা! তবে কি- ভাবিতেও বুক কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত পদে পুকুরের দিকে অগ্রসর হইলাম। কানে ভাসিয়া আসিল একটানা মৃদু কচ্‌-মচ্‌ শব্দ—শুকনো পাতার উপর দিয়া চলিলে যে রকম শব্দ হয়। সংশয়-শংকায় আমার বক্ষ দুরু-দুরু। ভাল করিয়া কান পাতিলাম, পুকুরের ঘাট হইতেই আওয়াজ আসিতেছে। আরো খানিক অগ্রসর হইয়া হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় লক্ষ্য করিলাম—ঘাটের পৈঠায় আসীন নারী-দেহই ত বটে। নিরুপমা তবে বাঁচিয়া আছে। একছুটে গিয়া পিছন হইতে তার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। ঝনাৎ করিয়া তার হাত হইতে একটি বাটি পড়িয়া গেল। "ওগো, বাবা গো" বলিয়া নিরু আমাকে সজোরে জড়াইয়া ধরিল। প্রকৃতিস্থ হইয়া যখন বুঝিল আমি ভূত বা ব্রহ্মদৈত্য নই—তারই হতভাগ্য স্বামী, তখন ভয়ের পরিবর্ত্তে, তার মুখে সোহাগের আভা দেখিলাম। এ ভাব অনেক দিন দেখি নাই, তাই মুগ্ধ হইলাম। নৈশ প্রকৃতির পটভূমি আবেশ-সঞ্চারে সাহায্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

বাটির রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় নিরুপমা লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, “ভেবেছিলুম আত্মহত্যা ক'রে তোমায় জব্দ করব। মরবার আগে চালভাজা খাবার বড় সাধ হ'ল, তাই—।” কার্ত্তিকের হিমে নিরুর দেহ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। বিছানায় শোয়াইয়া চাদর ঢাকা দিয়া দিলাম। চাদরে মুখ লুকাইয়া ফিস্‌ফিস্ স্বরে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিল—“হ্যাঁগা, মাছের কালিয়াটা কেমন খেতে হয়েছিল ?” আমি ভাবিতেছিলাম চালভাজার কথা। যার জোরে এতবড় সংকটের হাত হইতে আজ রেহাই পাইলাম।





"জয় হিন্দ্" দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। নির্জীব বাঙালী এই নব-মৃতসঞ্জীবনী সুরা পানে হঠাৎ প্রাণবন্ত হওয়ায় দিনে-দুপহরেই আঁৎকাইয়া উঠিতেছে। শিশু রাজীব গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া হোটেলওয়ালা ও ক্যালেণ্ডার বিক্রেতা পর্যন্ত এই মন্ত্র আওড়াইতেছে। ভ্যানিটি ব্যাগ, নতুন গুড়ের সন্দেশ, ডাইং-ক্লিনিংএর সাইনবোর্ড, প্রস্রাবাগারের দেওয়াল—সকলের বক্ষই "জয়হিন্দ্"-লাঞ্ছিত। এবার আমাদের পরাজয় অসম্ভব! সোদপুর হইতে ফিরিবার সময় লক্ষ্য করিলাম এ মন্ত্র "চিচিং ফাঁক" অপেক্ষাও কার্যকরী। শিয়ালদহের ফিরিঙ্গি টিকেট

কলেক্টর পর্যন্ত বশ মানিয়াছে। অকস্মাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলিয়া গেল।

প্রায় একমাস যাবৎ নারিকেল তৈল যোগাড় করিতে না পারায় গৃহিণীর সহিত মনান্তর চলিতেছিল। গন্ধ-বিহীন, আদি ও অকৃত্রিম তৈল ছাড়া তিনি আর কিছু স্পর্শ করেন না। সাবানের কারখানা হইতে কণ্ট্রোলের দোকান পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করিয়া জুতা ছিঁড়িয়াছে, কিন্তু বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল মিলে নাই। শেষে ঠিক করিলাম, বাজার হইতে নারিকেল কিনিয়া আনিয়া ঘরেই তৈল প্রস্তুত করিব। কিন্তু কপাল মন্দ—১ জোড়া নারিকেলের মূল্য ১ টাকা শুনিয়া চক্ষু স্থির হইয়া গেল। আর তৈল নিষ্কাশনের উৎসাহ রহিল না। সেই অবধি—বাহিরে না হউক, ঘরে আমার 'অপদার্থ' আখ্যাটির খুবই প্রচলন হইয়াছে। সোদপুর হইতে ফিরিয়া স্থির করিলাম এক বোতল বাজারের নারিকেল তৈল কিনিয়া তাহার উপর "জয় হিন্দ" শব্দ দুইটি জুড়িয়া দিব। কিছু না হউক, অসাধ্য-সাধনকারী এই মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষাও ত হইবে। "জয় হিন্দে"র জোরে দিল্লীর লাল কেল্লার ফটক খুলিয়া গেল, আর আমার গৃহিণীর মানভঞ্জন সম্ভবপর হইবে না?

খবরের কাগজ হইতে "জয় হিন্দ" অক্ষরগুলি কাটিয়া বোতলের গাত্রে সাঁটিয়া দিলাম। অর্থাৎ উহা "বিশুদ্ধ জয় হিন্দ নারিকেল তৈলে" রূপান্তরিত হইল। তারপর নির্ভয়ে সেটি স্ত্রীর হস্তে তুলিয়া দিলাম। বলিলাম, "পড়ে দেখ!" চক্ষের নিমেষে


Pramatha

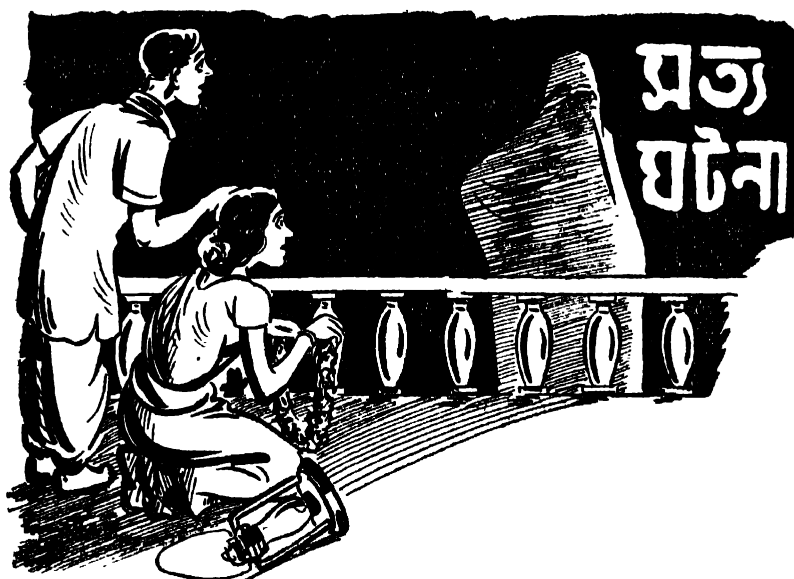


Man is (a) laughing animal …,

Animal is laughing (at) man ? (…)

ভোজবাজী ঘটিয়া গেল। সভয়ে দেখিলাম, তৈলাক্ত মোজেয়িকের মেঝেয় বিক্ষিপ্ত টুকরা কাঁচগুলি আমার দিকে চাহিয়া অট্টহাস্য করিতেছে। আশ্চর্য, "জয় হিন্দ" অংশটি অটুট আছে। সেটি হাতে তুলিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলাম, "তুমি জয় হিন্দের অপমান করলে!" অকস্মাৎ গৃহিণী হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁচের গুঁড়াসমেত বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল চুলে লাগাইতে লাগাইতে ফোঁপাইয়া বলিলেন, "আহা, আগে এ কথা বল্লে না কেন? মা, কালী! আমায় অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা কর, মা!" তৈলসিক্ত যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া চক্ষু বুজিয়া অস্ফুটে কহিলেন, "জয় হিন্দ্!" বিজয়গর্বে ঘরের বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চাকরকে ডাকিলাম, "রতন, চট্ করে এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয়! জয় হিন্দ্!" গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল।





ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে—আমাদের ভূতে বিশ্বাস এক আনা, আর ভূতের ভয় পনের আনা। কিন্তু এর উল্টোটাই যে সত্যি, মোটা কালিপদ এক রাত্রে প্রমাণ করে দিল।

তার আগের চুম্বকটুকু এই। কালীপদদের বাড়ীর একাংশ ভাড়া নিয়ে থাকতেন বিভূতিবাবুরা। ভদ্রলোক যৌবনেই টাইফয়েডে গত হলেন। কিছুদিন কান্নাকাটির পর বিভূতি বাবুর স্ত্রী ভৌতিকচক্রে মনঃসংযোগ করলেন। বুঝলেন, এটাই প্র্যাক্‌টিক্যাল! প্রতি সন্ধ্যায় বিভূতিবাবুর সূক্ষ্ম শরীর যাতায়াত করতে লাগল। কোনোদিন প্ল্যানচেটের ডগা ধরে লিখে দেন—আমি বড় দুঃখে আছি, 'বিরহ সইতে নারি'—আবার কোনদিন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই'; এই সব দেখে কালীপদর মা-ও ঝুঁকলেন।

স্বামীবিয়োগ অনেকদিনই হয়েছে, তবু এ রকম সামনাসামনি দেখলে কার না লোভ হয়? কালীপদর আপত্তি টিকল না। মস্তিষ্কটিও যে তার স্থূল দেহের অনুপাতেই তৈরী, এ সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ ছিল না। তবু বাড়ীতে একজনই বা নাস্তিক থাকে কেন? এক সন্ধ্যায় খিল-দেওয়া কক্ষে ভৌতিক চক্রের অধিবেশনে কালীপদরও স্থান হ'ল। চোখ উল্‌টিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে সে অশরীরী আত্মা-চালিত শীসক অবলম্বনে লিখে গেল,—

"১৪ই জুন ৭টা-২০ মিনিটে ছাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমি তোমাদের দেখা দেব—বিভূতি"! মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে কালীপদকে প্রকৃতিস্থ করা হ'ল। কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর'। এই ঘটনার পর তার্কিক কালীপদ প্রকৃত বিশ্বাসী বনে গেল। ১৪ই জুনের অপেক্ষায় আশা-আকাঙ্খায় সকলে দিন কাটাতে লাগলেন।

ক্রমে সেইদিন এল। বিভূতিবাবুর স্ত্রী টাট্‌কা বেলফুল আনিয়ে মালা গেঁথে রাখলেন। কালীপদর মা চেয়ে চিন্তে ১৪টা লণ্ঠন যোগাড় করলেন। কি জানি অন্ধকারে কি হয়! গোপনে সব ব্যবস্থা হ'ল—অতি সন্তর্পণে! ভূত যাতে গোল-মালে বিরক্তবোধ না করে! কলেজের ফুটবল টিমের খেলা ছিল দৌলতপুরে আগের দিন। কালীপদ রওনা হয়ে গেছে। ভূতের চেয়ে খেলা বড় হ'ল তার কাছে—মার এটা ভালো

লাগেনি। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, ১৪ই সন্ধ্যের আগে সে যেন ফেরে! এ সুযোগ জীবনে একবারই আসে।

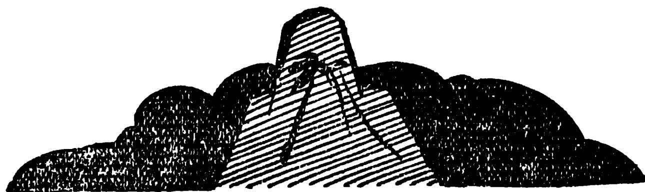
কোথায় দৌলতপুর আর কোথায় আমার মির্জাপুরের মেস! রাত্রে না ঘুমিয়ে কালীপদতে আমাতে মতলব ঠিক করা গেল। বিদেহী স্বামী কি সাধ্বী স্ত্রীর আশা অপূর্ণ রাখতে পারে? দেখা দিতেই হবে। কালীপদ মাঝে মাঝে ঘাবড়ে যায়, আমি চাগিয়ে রাখি। যাই হোক পৌনে ৭টায় রওনা হ'লাম দুই বন্ধুতে। কালীপদদের পাশের বাড়ী বিমলদের। তাদের ছাত দিয়ে ওদের ছাতে যাওয়া এমন কি কষ্টকর? বিমলের পিসীর কাছ থেকে চেয়ে নিলুম এক বড় সাদা বিছানার চাদর—ধোপদুরস্ত। বাবু-ভূত ত বটে! ঘুণাক্ষরে কেউ যেন না টের পায়! ছাতে উঠতে আমাদের ফুল-ব্যাক কালীপদরও পা কাঁপছিল। ভুতের সঙ্গে চালাকি যদি না টেকে! তা ছাড়া সূক্ষ্মবিচারে এ ত এডালটারি। অনেক পটিয়ে পটিয়ে কালীকে ত গরম রাখলুম। বললুম—তীরে এসে তরী ডোবাবি না কি? তুই চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবি, আমি চাদরের একটা খুঁট মাঝে মাঝে টেনে তোকে সাহস দেব'খন। দেশলাই জ্বালিয়ে রিষ্ট ওয়াচে দেখলুম ৭টা-১০ মিনিট। নীচের থেকে ১৪টা হারিকেনের কলধ্বনি কাণে ভেসে এল। বিভূতিবাবুর শালার গলা পেলুম—সেজদি, টর্চ্চটা নিয়ে যাব? সেজদি ভারাক্রান্ত গলায় বল্লেন—'না, না আলোয় ওঁরা দেখা দেন না। হারিকেনের আলো কমিয়ে সিঁড়িতে রাখ, সামনে এনো না।' আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কালীপদর মা'র ঝংকার শোনা

গেল সিঁড়িতে পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গেই। 'জানি, কেলেটা নাস্তিক, দেব-দেবীতে কোনো বিশ্বাস নেই। হতভাগার এখনও পর্য্যন্ত দেখা নেই।' এদিকে কালীপদ দেখা দেবার জন্য তৈরী হয়ে বসেছে।

পিছনে ঘোর কৃষ্ণ আকাশের পটভূমিতে বিমলদের বাগানের নারিকেল গাছ রহস্য সৃষ্টি করেছে। মাথার উপর দু' একটা বাদুড় দেরী করে ঘরে ফিরছে। কালীপদ ফিস্ ফিস্ করে বলছে—দক্ষিণ-পশ্চিম ঠিক আছে ত ? আমি বললুম, ঠিক! চুপ—এসে গেছে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হ'ল না—জন আষ্টেক হবে। কালীপদর মা বিড় বিড় করে গীতার মন্ত্র পড়ছেন। বিভূতিবাবুর স্ত্রীর একহাতে মালা, আরেক হাত দিয়ে চোখ মুছ্ছেন কি চুল ঠিক করছেন বোঝা গেল না। শ্যালকপ্রবর সকলকে অভয় দিচ্ছেন, কিন্তু কেউ বিশেষ এগিয়ে আসতে চাইছে না। আমি চাদরের খুঁট টানলুম। মোটা কালীপদ আস্তে আস্তে ছাদের কার্ণিশে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গেই—ঐ যে, ঐ যে—ওরে বাবাঃ, হে ভগবান—প্রভৃতি আর্ত্তকণ্ঠে একই সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। ১৪টা হারিকেনের সঙ্গে গড়াতে গড়াতে কালীপদর মা আর জনপাঁচেক সিঁড়িতে অন্তর্হিত হলেন। বিভূতিবাবুর স্ত্রী তবু নাছোড়বান্দা। ভাইয়ের হাত ধরে একটু একটু করে কালীপদর দিকে এগুতে লাগলেন। দু'দিন ধরে গাঁথা মালা বৃথায় যাবে ? আমি বুঝলুম, বেগতিক। চাদরের খুঁটে টান দিয়ে অস্ফুটে বললাম—frog leap ! কালী-পদ তিনমনি চেহারা নিয়ে থপ্ করে সামনে লাফিয়ে পড়ল।

বিভূতিবাবুর স্ত্রী 'ওরে মা'রে' বলেই অজ্ঞান। ভাই কোনো-রকমে তাঁকে হিঁচড়ে সিঁড়িতে নিয়ে নিমেষের মধ্যে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। বিভূতিবাবুর সূক্ষ্ম শরীরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে আমরা বিমলদের সদর দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলুম।

অন্ততঃ বিভূতিবাবুর স্ত্রীর ক্ষেত্রে 'ভূতে বিশ্বাস পনের আনা এবং ভূতের ভয় এক আনা'—এটা প্রমাণিত হয়েছিল। কালীপদর এতবড় গৌরবের মধ্যেও একটুখানি দুঃখের কালিমা ছিল। একটা লণ্ঠনের ভাঙ্গা কাঁচে তার মায়ের পা খানিকটা কেটে গিয়েছিল। শুকোতে লেগেছিল সতেরো দিন।





হাসির কথা শুনিলে যাহাদের চোখ জলে ভরিয়া আসে, আমি তাহাদের দলে। চোখের দোষ আছে বলিয়া যে আঁখিজল গড়াইয়া পড়ে তাহা নয়, আসল কথা—নামজাদা বিলাতী দন্তমঞ্জন ব্যবহার করিয়া (মানহানির দায়ে পড়িব বলিয়া নাম করিলাম না) অকালে দাঁতগুলি হারাইয়াছি। এবং ফোক্‌লা মুখের হাসি যে-

বয়সে মানায় সে-বয়সে পৌঁছতে আমার অনেক বাকী। নিজে হাসিয়া অপরকে হাসাইবার অভিরুচি আমার নাই। অনেক কাল হাসি নাই বা হাসিতে পারি নাই বলিয়া আজ অন্ততঃ মনে মনে হাসিবার সাধ জাগিয়াছে। নহিলে হাসি সম্পর্কে আলোচনা করিবার পাত্র আমি নই।

বাল্যকালের কথা মনে পড়িতেছে। সতীর্থদের কেহ মুখ গোমড়া করিলে "রামগরুড়ের ছানা" বলিয়া ঠাট্টা করিতাম। আজ দেখিতেছি, মুগ্ধ বঙ্গ জননী সাত কোটি সন্তানকে পাকেচক্রে রামগরুড়ের বংশ বানাইয়া ছাড়িয়াছেন। তেলের লাইনে, রেশনের দোকানে, কাপড়ের কিউ-এ, বাস-এর পিছনে, ট্রামের চালে পঞ্চমাকৃতি মুখের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে—দলের মধ্য হইতে হঠাৎ কেহ হাসিয়া উঠিলে হয় তাহাকে সকলে 'পাগল' সাব্যস্ত করিবে কিংবা সচকিত হইয়া আতঙ্কে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিবে। প্রাচীন কালে আর বর্ত্তমান যুগে কত তফাৎ! 'মজন্তালী সরকার' হাসিতে হাসিতে পেট ফাটিয়া মরিয়াছিল, আর এ কালের সরকারী আমলে প্রজারা কাঁদিয়া বাঁচিতেছে। গুপ্ত কবি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা!" আজ এই পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীরূপে বাঁচিয়া থাকিলে কি বলিতেন জানিতে ইচ্ছা করে। ভারত রক্ষা আইনের ভয়ে মুখ বুজিয়া থাকিতেন কি?

কোনো মনীষী বলিয়াছেন, Man is a laughing animal. আজ এই আপ্তবাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া জন্তুরা মানুষের দশা দেখিয়া হাসিতেছে। তাহাদের রেশনিং সিষ্টেম নাই, কাপড় জামার বালাই কোনো কালে ছিল না (ভবিষ্যতে থাকিবে কিনা কে জানে?)—সর্ব্বোপরি সাম্প্রদায়িক কলহ হইতে তাহারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। 'হিংসা পরম ধর্ম্ম' জ্ঞান করা সত্ত্বেও তাহাদের রাজত্বে এখনও পর্য্যন্ত ১৪৪ ধারা জারী হয় নাই। মানুষ বাঘ না মারিয়া ক্ষেপিয়া গিয়া নিজের ভাইকে মারিতেছে—এ দেখিয়া বাঘ ত দূরের কথা পিপীলিকাও অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! 'মাথায় ছোট বহরে বড়' যে বাঙ্গালী সন্তান এতদিন Laugh and grow fat প্রবাদ-বাক্যের মর্য্যাদা রাখিয়াছিল, আজ সেই বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর হাতের মার খাইয়া দৈর্ঘ্যে বাড়িতে সুরু করিয়াছে; বরাদ্দ কাপড়ের সঙ্গে দেহের মাপের inverse ratio!

হাস্যরসের আলোচনা করিতে গিয়া বাজে কথায় মজিয়া গিয়াছি। যাক্, কাজের কথায় আসা যাক্। কিন্তু কেবল কান্নার কথাই মনে পড়িতেছে। বাড়ীতে খুকীর ও বিড়ালের কান্না, রাস্তায় ভিখারীর, প্রতিবেশীর মড়াকান্না, অফিসে মনিবের মায়া কান্না—কান্নায় ঘেন্না ধরিয়া গিয়াছে। কিন্তু না কাঁদিয়া উপায় নাই। আধুনিক কবিতায় বলুন, অতি আধুনিক সিনেমায় বলুন—কান্না ছাড়া বাঙ্গালীর গতি কোথায়? আগে বিদেশীদের হাসিতে দেখিতাম বটে, কিন্তু "কুইট ইণ্ডিয়া"র ঠেলায় তাহারাও কাঁদো কাঁদো! শেষ পর্য্যন্ত পুলিশও আমাদের পিছনে লাগিয়াছে।

বিনা দোষে Tear gas ছাড়িয়া আমাদের কাঁদাইয়া তাহাদের কি লাভ বুঝিতে পারি না। সকলকেই hypochondriac melancholiaয় ধরায় এক জাতীয় ডাক্তারদের পশার বাড়িয়া গিয়াছে। চোখের ডাক্তারদের ভাগ্যেও যে কিছু না জুটিতেছে তাহা নহে। থিয়েটারে ভাঁড়দের পরিবর্ত্তে করুণস্বরে বেহালার ছড়ি টানিয়া রস জমাইবার চেষ্টা চলিতেছে। হাস্যরসিকরা বেকার।

হাসির কথা পাড়িতে গিয়া ক্রন্দন-বন্দনা গাহিলাম বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, তবে আমি নাচার। হো হো শব্দে হাসিবার চেষ্টা করিতে গিয়া হাউ হাউ রবে মন ডুকরাইয়া উঠিতেছে। সকলের দশাই ত আমার মত। মুখ বুজিয়া থাকার ফলে দাঁত আছে কি নাই তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় কোথায়? তবু হাস্য-রসভারাক্রান্ত সাপ্তাহিক পত্রিকার চাহিদা ক্রমশঃ বিপুলভাবে বাড়িতেছে—এ রহস্যের সমাধানের জন্য একটি enquiry commission স্থাপন করিলে কেমন হয়?





নব্য-কলা-প্রদর্শনীর সম্মুখে অসম্ভব ভীড় জমিয়াছে। কয়েক-দিন ধরিয়া নানা পত্রিকায় সাড়ম্বর বিজ্ঞাপনের ফল প্রত্যক্ষ। কোনো মতে একখানি টিকিট কিনিয়া প্রবেশ করিলাম। ছবির চেয়ে দর্শকবৃন্দই বেশী দ্রষ্টব্য বলিয়া বোধ হইল। অতি আধুনিক শাড়ী, অতি আধুনিক মিলিটারী স্যুট প্রগতিশীল শিল্পের সহিত সমানভাবে পাল্লা দিতেছে। এবার ছবির দিকে চোখ পড়িল। ফিরাইতে পারিলাম না। ডিম্বাকৃতি, ত্রিভুজাকৃতি জ্যামিতিক প্যাঁচে বন্দিনী হইয়া শিল্পলক্ষ্মী পরিত্রাহি চীৎকার ছাড়িতেছেন মনে হইল। লক্ষ্মী সন্দেহ নাই—প্রমাণ ছবির নীচে অঙ্কিত অঙ্কগুলি।

যে ছবিটাকে ঘিরিয়া সবচেয়ে ভীড়, তার সম্মুখে গিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। একটি কারুকার্য্যখচিত ফ্রেম, কিন্তু ক্যান্‌ভাস নাই। আছে শুধু নীচের অঙ্কটি—৫০০০৲। বুঝিলাম ছবিটি প্রদর্শনী হইতে সম্প্রতি চুরি হইয়া গিয়াছে সেই জন্য এই ভীড়। আহা, সেরা ছবিটিই দেখা হইল না! পরক্ষণেই ভুল ভাঙ্গিল। দেখিলাম, সকলেই উৎকর্ণ হইয়া বিখ্যাত শিল্প-ব্যাখ্যাতার বক্তব্য শুনিতেছে। ইঁহার নাম শুনিয়াছিলাম—চিনিতাম না, চিনিলাম। তিনি ক্যান্‌ভাসবিহীন ছবিটির মর্ম্ম তাঁহার প্রধান শ্রোতা শিয়ালকুঠির মহারাজাকে বুঝাইতেছেন। মহারাজা মেদনিমজ্জিত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতেছেন। ব্যাপার সঙ্গীন দেখিয়া ক্যাটালগ খুলিলাম। অমুক-অঙ্কিত তেল-রঙা ছবি—"গরু ও ঘাস"—দাম—৫০০০৲। চোখ কচলাইয়া আবার শূন্য ছবির দিকে চাহিলাম। পিছনের দেওয়াল ব্যঙ্গ ভরে হাসিতেছে বোধ হইল। শুনিলাম, ব্যাখ্যাতা বলিতেছেন—"এটি এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ বাস্তব চিত্র। সাধারণ জীবন থেকে মাল-মশলা নিয়ে এরকম উঁচু দরের শিল্প সৃষ্টি করা শুধু অমুকেই সম্ভব।" মহারাজা (বিড়ম্বিত হইবার ভয়ে) অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু গরুটি কই? দেখতে পাচ্ছি না ত'!" ব্যাখ্যাতা মৃদু হাসিয়া এই অতি সহজ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বলিলেন, "ঘাস খাওয়া হ'লে গরু কি দাঁড়িয়ে থাকে, মহারাজ?" এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া মহারাজ লজ্জিত বোধ করিলেন। তবুও বোকার মত আমার মুখ হইতে আরেকটি প্রশ্ন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিল। "ঘাস কোথায় স্যর?" আর্ট-ক্রিটিক কৃপা-কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন—"গরুর পেটে।" শিয়ালকুঠির মহারাজা দ্বিরুক্তি না করিয়া

৫০০০৲ টাকার চেক কাটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেমটির আরেকটি কোনে 'sold' কথাটি লিখিয়া দেওয়া হইল। ভীড় হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইতে গিয়া আমার জামার কিয়দংশ ছিঁড়িয়া গেল।

কে গরু এবং ঘাস কতখানি, পাঠকদের উপর তাহা বিচারের ভার রহিল।





হরিজন-সেবার হিড়িক লাগিয়া গিয়াছে। সুদূর মস্‌লিপত্তমের মন্দিরদ্বার হইতে হরিজনপ্রীতির ঢেউ দর্জিপাড়ায় বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্থির করিয়াছেন, গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের পূজায় মেথর রামলালকে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবেন। কিন্তু গৃহিণীকে সে কথার আভাস দিতেই তিনি মেথরের ঝাঁটাকে উপলক্ষ্য করিয়া কি একটা নিষ্ঠুর ইঙ্গিত করিয়াছেন। নিরুপায় দেখিয়া তিনি কনিষ্ঠ পুত্র হারুকে দলে টানিয়াছেন। পিতা-পুত্রের গোপন পরামর্শে ঠিক হইয়াছে যে কর্পোরেশনের নূতন ছোকরা ধাঙ্গড় বংশীর সম্বর্দ্ধনা করিয়াই হরিজন-সেবা সম্পন্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে গৃহিণীর কর্ণে

কথাটা উঠিবার সম্ভাবনা কম। বাহিরের ঘরে খিল লাগাইয়া অনুষ্ঠান সারা প্রয়োজন।

হারু পাশের বাড়ী হইতে মহাত্মা গান্ধীর বাঁধানো ছবিখানি আনিয়া বৈঠকখানায় টানাইয়া রাখিয়াছে। সত্যেন দত্তর 'মেথর' কবিতাটি ভোরে উঠিয়া মুখস্থ করিয়াছে। তাহার উৎসাহের অন্ত নাই। বিশ্বম্ভরবাবু মনে মনে দুর্গা নাম জপিতেছেন, গৃহিণী টের পাইলেই এই পুণ্যকর্ম্মের গঙ্গালাভ অব্যর্থ। বংশীকে আট আনা পয়সা দিয়া রাজী করানো হইয়াছে, সে কাজ সারিয়া সাবান মাখিয়া স্নানের পর দ্বিপ্রহরে বিশ্বম্ভর বাবুর বৈঠকখানায় সন্তর্পণে উপস্থিত হইবে। ব্যাপারটা সে বুঝিয়া উঠে নাই। যাই হোক্, বাবু কোনো কাজের জন্য ডাকিয়াছেন, এইটাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

হারু দুইটা হইতে রোদ মাথায় করিয়া বিডন রো'র মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। হাতে একটি মোড়ক, তাহার ভিতর বংশীকে পরাইবার জন্য ধুতি। বহুক্ষণ পরে বংশীর দেখা পাওয়া গেল। স্নান করিয়া টেরি কাটিয়াছে, অঙ্গে আধময়লা ছিটের সার্ট। এই বেশে বাবুদের সামনে আসিতে তার লজ্জার অবধি ছিল না। বংশীকে দেখিয়া বিশ্বম্ভরবাবু বাজার হইতে কেনা গাঁদা ফুলের মালাটি তাহার গলায় সযত্নে পরাইয়া দিলেন। বংশী ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। তারপর যখন বিশ্বম্ভরবাবু "আইয়ে, আইয়ে বন্‌শীবাবু" বলিয়া তাহাকে বৈঠকখানায় ঢুকাইলেন, সে রীতিমত

ঘাবড়াইয়া গেল। এই কয়েকমাস মাত্র সে মজঃফরপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া কাকা হরদয়ালের সুপারিশে কর্পোরেশনের চাকুরীটি পাইয়াছে। আজব শহর কলিকাতার অনেক কিছু দেখিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কিন্তু কেহ তাহাকে ফুলের মালা পরাইয়া আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। বছর সাতেক আগে সাদীর সময় সে ফুলের মালা পরিয়াছিল বটে, মদ খাইয়া নাচ-গানও হইয়াছিল—কিন্তু আবার কেন?

হারু মোড়ক খুলিয়া ধুতিটি পরিতে দিল বংশীকে। বিশ্বম্ভর বাবু তাহার কপালে চন্দন চর্চ্চিত করিয়া দিলেন। বংশী লজ্জায় ভয়ে ক্রমঃশই সংকুচিত হইতে লাগিল। হারু আবৃত্তি করিয়া গেল—

কে বলে মেথর তুমি অস্পৃশ্য অশুচি
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ··

আবৃত্তি শেষ হ'লে বিশ্বম্ভরবাবু হারুকে বলিলেন, দেখে আয় ত তোর মা ঘুমোচ্ছে না জেগে উঠেছে। তারপর বংশীকে দাঁড় করাইয়া মোড়ের দোকানে মিষ্টি আনিতে ছুটিলেন। বংশীর মনে পড়িল, ঠাকুরমার কাছে ছোট বেলায় ডাকাতদের কালী পূজার গল্প শুনিয়াছিল। তাহারা নাকি জংগলের মধ্যে মন্দিরের সামনে নরবলি দেয়! সে ত এই প্রকারই। ফুলের মালা, চন্দন, নববস্ত্র, মন্ত্রপাঠ—সবই ত মিলিয়া যাইতেছে! বাবু

বোধ হয় এইবার খাঁড়া আনিতে গিয়াছেন। অতএব সে বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া প্রাণ ভয়ে ঊর্দ্ধশাসে ছুটিতে লাগিল। মা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন, এই খবর দিতে আসিয়া হারু দেখিল গাঁদার মালাগাছি ভূমিতে পড়িয়া আছে—হরিজন বা হরিজন-সেবক কেহই নাই।





রাঁচির পাগলা গারদ দেখিতে গিয়াছি। বেশ সুস্থ মস্তিষ্কেই যাত্রা সুরু করিয়াছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। ব্যাপারটা খুলেই বলি।

গারদখানার গেট পার হইয়া অফিসে পৌঁছিতেই একটি হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক আসিয়া স্মিতহাস্যে আমাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। বোধ হইল দপ্তরের কোন বিশিষ্ট কেরাণী। পাগলের সহিত কারবার করিয়াও মেজাজটি প্রফুল্ল রাখিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্য লাগিল। যাহা হউক, পাগল সন্দর্শন সুরু করিলাম। ভদ্রলোক সঙ্গী হইলেন। সুবিধাই হইল। পাগলের ইতিহাস শুনিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করা যাইবে।

এক নম্বর। পরাণ সামন্ত। দাড়িগোঁফে মুখ ভর্ত্তি। অত্যন্ত শান্ত ভাব। কড়ি কাঠের দিকে চাহিয়া বোধ করি গুণিবার জিনিষ খুঁজিতেছিলেন। শুনিলাম, ইনি ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। রূপালি পর্দ্দায় এক ক্রাইম্ ড্রামা দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া যায়। ছবির আখ্যান ভাগে ছোট ভাই কি করিয়া তাহার বড় ভায়ের ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করে ও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে হত্যা করিয়া দ্বীপান্তরিত হয় তাহাই বর্ণিত ছিল। সিনেমা হইতে ফিরিয়া পরাণ সামন্তর মাথায় ঢুকিল তবে সেও ত একদিন তাহার পিতৃতুল্য ভাইকে হত্যা করিতে পারে। এই চিন্তা তাহাকে এতই পাইয়া বসিল যে দাদার সাম্‌নে আসিতেও দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল। শেষে যন্ত্রণার হাত হইতে এড়াইবার জন্য বিদেশে চাকুরী লইয়া চলিয়া গেল। দীর্ঘ দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরও এই বিভীষিকা তাহাকে ছাড়িল না। চাকুরী হইতে ছুটি লইয়া সে বাড়ী ফিরিল এবং অবশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সম্পূর্ণ উন্মাদ বনিয়া গেল। Fixed ideaর একটি চাক্ষুষ উদাহরণ।

দুই নম্বর। ভদ্রলোক বলিলেন, ইঁহার নাম অধ্যাপক করালীকান্ত বটব্যাল। তাঁহার এক ছাত্রীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু প্রস্তাব করিবার পূর্ব মুহূর্তেই শুনিলেন তাঁহারই প্রিয়তম ছাত্র ছাত্রীটিকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বেচারা ভগ্ন হৃদয় এবং বিকৃত মস্তিষ্ক লইয়া নিরুপায় হইয়া এখানে বাসা বাঁধিয়াছেন।

রস জমিয়া উঠিতেছিল। ভদ্রলোককে না পাইলে গারদ পরিক্রমণ বৃথা হইত! আরো ইন্‌টারেস্‌টিং পাগলের সন্ধানে চলিলাম। পথে চোখ পড়িল বছর বারো বয়সের একটি সুঠাম সুন্দর কিশোরের দিকে। সে তাহার প্রকোষ্ঠের সুউচ্চ জানালার উপরে উঠিয়া পরম আনন্দে বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ছেলেটিও কি পাগল? ভদ্রলোক উচ্চহাস্যে আন্দোলিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

জানিলাম, এটি repressionএর নিষ্ঠুর ফল। ছেলেটি পেয়ারা খাইতে বড়ই ভালবাসিত। পিতা ছিলেন এই অভ্যাসের কঠোর সমালোচক। তাঁহার প্রৌঢ়ত্ব কিশোরসুলভ চপলতাকে উপহাস করিবে ইহাতে বিচিত্র কি?

অনেক চেষ্টা করিয়া এই কদভ্যাস ছাড়াইতে না পারায় শেষে একদিন তিনি পুত্রকে হাত-পা বাঁধিয়া ঘরে ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ করিয়া রাখেন। দরজা খুলিয়া দেখিলেন, সে দেয়াল বাহিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। ক্রমে মস্তিষ্ক বিকৃতির ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। অদূরদর্শিতার পরিণাম একটি সুন্দর সুস্থ বালকের বিলুপ্ত জীবন।

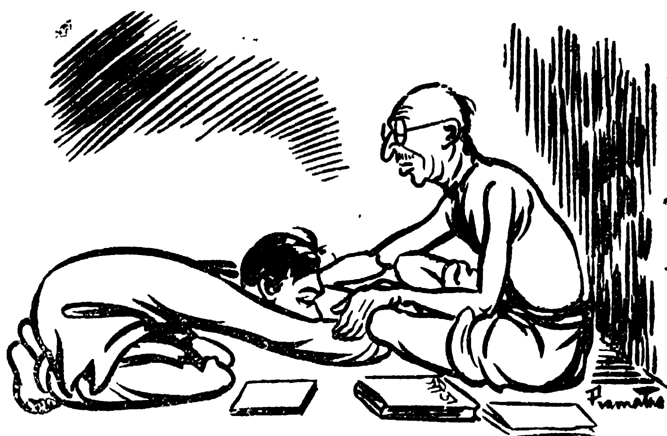
মনটা ভারী হইয়া উঠিল। মজা পাইবার আশায় পাগল দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রচ্ছন্ন বেদনার কথা ভাবি নাই।

তাড়াতাড়ি দেখা সারিয়া অফিসের দিকে ফিরিলাম। ভদ্রলোকের কলিজায় ঘাটা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁর কোন ভাব পরিবর্তনের লক্ষণ দেখিলাম না। যাহা হউক, ভদ্রলোকটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইলাম। পিছন ফিরিতেই শুনিলাম, তিনি আমাকে ডাকিতেছেন। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি ভদ্রলোকের আর এক মূর্ত্তি। রোধ কষায়িত লোচন, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, আস্তিন আ-বাইসেপ্‌স আকর্ষিত—দেখিয়া ভয় পাইলাম। মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটিল? বজ্রকণ্ঠে ভদ্রলোক বলিলেন, "দাঁড়ান মশাই ঠিক ঐ জায়গায়—আপনার নাকে একটা ঘুঁষি মারব!" বজ্রাহত বনস্পতির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। মাথায় এতক্ষণ সাইকো-এ্যানালিসিসের স্রোত বহিতেছিল, হঠাৎ যেন প্রচণ্ড তুষারপাতে সেই স্রোত জমাট বরফ হইয়া গেল! কাঁকের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছুটিয়া আসিয়া রক্ষা না করিলে সে যাত্রা আর ফিরিতে হইত না।

শুনিলাম, ভদ্রলোক তাঁর যৌবনে একজন খ্যাতনামা মুষ্টি-যোদ্ধা ছিলেন। ইংরেজ, নিগ্রো, প্রভৃতি বিদেশীয় বড় বড় বীরকে পরাজিত করিয়া শেষে এক কাবুলীর কাছে তাঁহাকে হার স্বীকার করিতে হয়। সেই মনোবেদনার পর তিনি পাগল হইয়া যান। আপাততঃ অন্য কোনো বিষয়ে গোলমাল নাই, শুধু পরিদর্শনকারীরা বিদায় লইবার পূর্বে একবার তিনি তাঁদের মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান করেন। অফিসের কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে আর পাগলদের মধ্যে রাখা

হয় নাই। রাঁচি হইতে ফিরিয়া একদিন ফুটবল খেলার মাঠে গিয়াছিলাম। গোল হইবার পূর্ব মুহূর্তে আড়চোখে দর্শকদের দিকে তাকাইতে ভদ্রলোকের কথা মনে পড়িল। আমাদের অঙ্গভঙ্গিগুলিই কি সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ ? আমরাও কি তবে মুক্ত পাগল ?





স্বাক্ষর শিকার

বাঘ-ভালুক শিকার করতে গিয়ে শিকারীরা বিপদে পড়েন, এ ত সকলেরই জানা আছে—কিন্তু স্বাক্ষর শিকারের বিপদ সম্বন্ধে কিছু জানা আছে কি ? তবে শুনুন ! এই সখ মেটাতে গিয়ে আমায় বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত - এমন কি প্রহৃত পর্য্যন্ত হতে হয়েছে। প্রথমে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবের কথাই ধরা যাক্। অহিংসা মন্ত্র জপ করতে করতে ভায়া শেয়ালদা সোদপুর পৌঁছলাম। অগণিত জনতা ঠেলে এগিয়ে বাঁখারির বেড়া যখন টপ্‌কেছি, নতুন-কেনা খদ্দরের ধুতিটি চিচিং ফাঁক। যাই হোক কোনোরকমে লজ্জা ঢেকে, প্রতিহারীদের হাঁ হাঁ থেকে মাথা বাঁচিয়ে সটান গিয়ে riot victim এর ষ্টাইলে মহাত্মাজীর পা দুটো জড়িয়ে ধরলাম। মৃদু হেসে শুধু রাষ্ট্র-ভাষায় শুধোলেন, 'কি চাই বৎস ?' কপালের ঘাম মুছে মরি বাঁচি করে বল্‌লাম—'আপনার স্বাক্ষর মাংতা হ্যায়, বাপুজী !'

অধ্যাপক নির্ম্মল বসুর অধ্যাপনার গুণে সহজেই আমার বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষা হৃদয়ঙ্গম করে স্মিতহাস্যে মহাত্মাজী তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন! কম্পিত করে অটোগ্রাফের খাতাখানি তুলে দিলাম। বাপুজী ডান হাতে কলম ধরে বাঁ হাত আবার আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ভাবলুম, আর একখানা খাতা চাইছেন নাকি? একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম—বাঙালী মেয়ে আভা গান্ধী এসে রক্ষা করলেন। কানে কানে বললেন, ৫৲ হরিজন দক্ষিণা দিন! তাই তো! প্রণামীর কথা মনেই ছিল না, আছে ত পকেটে? কে জানে? যাই হোক সিকি, দুয়ানি, ফুটো পয়সায় ৫৲ গুণে দিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পাই!

এবার গুরুদেবে আসা যাক! তখনো পারিষদবর্গ-প্রবর্ত্তিত দক্ষিণা গ্রহণের ব্যবস্থা পেকে ওঠে নি। তাছাড়া এক জমিদার-পুত্রের সঙ্গী হয়ে সেবার কবি-কুলশিরোমণি সন্দর্শনে যাই শান্তি-নিকেতনে। অর্থাৎ উত্তরায়ণের অন্দরমহলে। কবি মাথা নীচু করে লিখছিলেন। পায়ের শব্দ পেয়ে এমন জোরে গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন যে আমি সভয়ে আড়াই হাত পশ্চাদপদ। প্রথম ধাক্কাটা সামলে যেই দাঁড়িয়েছি, বনমালী চাকর এসে বলে উঠ্‌ল—বাবু মশায়ের অন্ন প্রস্তুত। অটোগ্রাফটা যায় বুঝি ফস্‌কে! কবি আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'পকেটের খাতাটা কি স্বাক্ষর সংগ্রহের?' কবির যোগ-বিয়োগের ক্ষমতা আছে, এটা আমার জানা ছিল না। লিখলেন—

ভবঘুরের মনটা কোথায় দূরে
ঘুরে বেড়ায় ঘর-ছাড়ানোর সুরে!



'দাঁড়ান মশায় ঠিক ঐ জায়গায়—আপনার নাকে একটা ঘুসি মারব' (পৃঃ ৬১)



চোখ উলটিয়ে গোঁ গোঁ শব্দে সে অশরীরী আত্মাচালিত শীসক অবলম্বনে লিখে গেল। (পৃঃ ৪৩)

অর্থাৎ পাকে প্রকারে আমাকেই ভব-ঘুরে বলা হ'ল! সকালে আবার চুলে তেল মাখতেও ভুলে গিয়েছিলাম। যাই হোক বক্রোক্তিটা চট্ করে হজম করে ফেলে দেখলাম—কবিসার্বভৌমের হাতের লেখা পেয়ে আমার অটোগ্রাফ খাতার বুক সগর্ব্বে ফুলে উঠেছে। কৃতজ্ঞতা জানাতে যাব—এমন সময় বনমালীর তাড়া খেয়ে একেবারে উত্তরায়নের বাইরে।

পাঠানের অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে সে এক বিপদ! সীমান্ত গান্ধীর খাঁটি অহিংসার কথাই বরাবর শুনেছি। খাতা এগিয়ে দিতেই—সেই ৬ ফিট ৩ ইঞ্চি লম্বা মানুষটির বাঘের মত থাবা



'বাঘের মত থাবা বুকের ওপর এসে পড়ল'

বুকের ওপর এসে পড়ল। ওরে বাবা! অথচ মিষ্টি গলার স্বর কাণে এসে লাগল—কাজ করো, কাজ করো—স্বাক্ষর কুড়িয়ে বেড়ানো কি একটা কাজ?

মাই গড্! চাপড়টা তাহলে আদর!

অনেক খরচা-পত্র করে বার্নার্ড শ'র কাছে খাতা পাঠিয়েছিলুম। সে খাতা সত্যি সত্যিই ফিরে এলো। লেখা রয়েছে —'তোমার মত মূর্খদের খাতায় আমি স্বাক্ষর দিই না।......জর্জ বার্ণার্ড শ।' কে মূর্খ, বলুন তো মশায়? স্বাক্ষর দিয়ে বলে কিনা স্বাক্ষর দিই না। বড় মানুষদের মাথায় একটু ছিট থাকে বৈ কি!

অপমান স্বাক্ষরশিকারীর অঙ্গের ভূষণ। সরোজিনী নাইডুকে সই করতে বলায় তিনি বজ্রনির্ঘোষিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "চোর কোথাকার।" অর্থাৎ আমি তাঁর মূল্যবান সময় চুরি করতে এসেছি! এক মাড়োয়ারী ধনকুবের ত দারোয়ান দিয়েই হাঁকিয়ে দিলেন। ভাবলুম আপিসের বড় সাহেবের একটা সই রেখে দি! খাতায় মহাপুরুষদের নামের পাশে নিজের নাম বসাতে পারলে সাহেব হয়ত খুশিই হবে। (ফলে লেটের জন্য মাইনে না কাটতেও পারে।) হায় পোড়া কপাল! খাতা খুলেই সাহেব দেখে নেতাজীর সই; তার সঙ্গে যা লেখা রয়েছে তার ভাবার্থ— শুধু বৃটিশসাম্রাজ্যবাদ আমাদের শত্রু নয়, পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়তে হবে। সাহেব পেপার-ওয়েটটা উঠিয়ে চীৎকার করে উঠল, "To hell, I'll sack you!" চাকরী খুইয়ে এবং প্রাণটা বাঁচিয়ে সে যাত্রা ফিরে এলাম।

দুঃখের কথা বাড়িয়ে আর লাভ কি ? এবার শেষ করি। ট্রাম-বাসের ভিড়েও যে চশমা জোড়াটিকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলাম সেটি কেমন করে' ভাঙ্গল শুনুন। সেদিন বাসেই যাচ্ছিলাম। প্রচণ্ড ভিড়। পাঞ্জাবী কনডাক্‌টর গোঁৎতা মেরে আরো লোক ঢোকাবার চেষ্টা করছে। আমাদের দশা ত্রিশঙ্কুর মত। একটী বাঙালী মহিলাও রড ধরে দোল খাচ্ছেন, লেডীজ্ সীট সব ভর্ত্তি ; তা ছাড়া তিনি পুরুষদের অনুকম্পার প্রত্যাশী নন। কনডাক্‌টার বুঝি তাঁকেও গোঁৎতা মেরেছে। মহিলাটি ঘুরে দাঁড়িয়ে দাড়ি-বিমণ্ডিত গালে সজোরে একটি চড় কষালেন। পাঞ্জাবী মহিলা-ভয়-চকিত-মূঢ় এবং আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। চমক ভাঙ্গতেই পকেট থেকে আটোগ্রাফের খাতাটি বার করে মেলে ধরলাম বীরাঙ্গনার সামনে। দ্বিতীয় চড় এসে পড়ল আমারই গালে। "মা বোনের ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারে না ; আবার ঢং করে সই কুড়ানো হ'চ্ছে ! যত সব বকাটে ছোকরা।"

মাথা ঘুরছিল বটে, তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এবার নিজেই একটি সই করে অনেক অপমান উৎপীড়নের স্মৃতি চিহ্ন এই অটোগ্রাফ খাতাখানি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিব।





রায় বাহাদুর করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

'একজন অভিজ্ঞ সাহিত্যিক চাই। শ্রুতিলিখনে অভ্যাস থাকা প্রয়োজন। খাওয়া ও বাসস্থান ফ্রী। মাসিক পারিশ্রমিক ১৫০৲। প্রশংসাপত্র সহ সত্বর আবেদন করুন! বক্স নং—৯৯৯৯।

প্রথম 'আবেদন' এলো শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। আবেদন পড়েই রায়বাহাদুরের চোখ কপালে উঠ্‌ল। তা'তে লেখা আছে—

"আমি 'যার স্বামী বিদেশে', 'হায় রে অভিমানিনী নারী' প্রভৃতি বিখ্যাত পুস্তকের রচয়িতা। যাঁরা আমার লেখা পড়ে খুশি হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায় বাহাদুর করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেঠ দামোদর লাখপতিয়া, শ্রীমতী তন্বী তরফদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।"... করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোর চোখ কপালে উঠ্‌ল এইজন্য যে তিনি জীবনে মাত্র একখানি বাংলা উপন্যাস পড়েছেন—তার নাম "জেনানাস্তান"! রচয়িত্রী তাঁর স্ত্রী, নবীনা লেখিকা শ্রীমতী ঈপ্সিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (আসল নাম—জগন্মোহিনী দেবী)। এই ছোকরা বলে কি না, তিনি "যার স্বামী বিদেশে" প্রভৃতি পড়ে খুশি হয়েছেন। বইয়ের নাম যে এরকম ভয়াবহ হয় তাও তিনি কখনও শোনেন নি! বিষম কৌতূহল হ'ল রায়বাহাদুরের। তবে কি কাগজের অফিসের কোনো ফাজিল ছোক্‌রার এই কাজ? হয়ত বিজ্ঞাপন বিভাগ থেকে তাঁর নামটি জেনে নিয়েছে। যাই হোক্ একবার ডেকে পাঠিয়ে সন্দেহ ভঞ্জন কর্‌তে হয়। বয়স্থ লোককে স্ত্রীর "সেক্রেটারী" রাখতে হবে। এই সব ডেঁপো ছোক্‌রাদের দিয়ে কি আর কাজ চলে?

আধুনিক সাহিত্যিক তরুণ চট্টোপাধ্যায় এলো রায় বাহাদুরের

সঙ্গে দেখা কর্‌তে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো (এখন ত' তেল পাওয়া যায় না, যখন পাওয়া যেত তখনও এই রকম ছিল)। জ্যৈষ্ঠ মাসেও পায়ে গরম মোজা। জামায় বোতামের বালাই নেই। হাতে খানকয়েক বই। রায় বাহাদুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি চেন? যুবক বল্‌ল, "আজ্ঞে না!" "তবে তিনি তোমার প্রশংসা করেছেন, একথা লিখেছ কেন?" তরুণ চট্টো উত্তর দিল, "কথাটা সত্য বলে ।" প্রমাণ? "হ্যাঁ, প্রমাণ আছে বৈ কি! রায় বাহাদুর করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী-ই এ কথার সত্যতা সপ্রমাণ কর্‌বেন!"—রায় বাহাদুরের চোখ আর একবার কপালে উঠল! তিনি যুবককে বৈঠকখানায় বসিয়ে বিহ্বলচিত্তে অন্দরাভিমুখী হলেন।

ঈপ্সিতা দেবী শুনে বল্‌লেন, "হ্যাঁ গা, তোমার মনে নেই— সেই যে 'অভিমানিনী নারী' পড়িয়ে শোনাচ্ছিলুম; তুমি বেশ, বেশ, চমৎকার বল্‌তে বল্‌তে ঘুমিয়ে পড়লে! আমি পাশের বাড়ীর মেনকাকে বলেছিলুম—তরুণ চাটুয্যের লেখা তোমার খুব ভাল লাগে।" তা, সে কথা যে স্বয়ং লেখকের কানে গিয়ে পৌঁছবে তা ত' ভাবিনি। আশ্চর্য বটে! রায় বাহাদুর মনে মনে খুশি না হ'লেও দ্বিতীয় পক্ষের লেখিকা সহধর্ম্মিনীকে মুখে জিগেস্ কর্‌লেন—'তা হলে একেই তোমার 'সেক্রেটারী' রাখার ইচ্ছে? সুমধুর হাস্যে বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত করে স্ত্রী বললেন, নিশ্চয়ই! এত বড় সাহিত্যিক বাড়ীতে আস্‌বে—এ আমাদের ভাগ্যের কথা। করঞ্জাক্ষ বন্দ্যো ক্ষীণ গলায় আপত্তির সুর

তুল্‌লেন—"যা চোয়াড়ের মত চেহারা!" গিন্নী আগ্রহে বলে উঠলেন—'ও এবাড়ীতে দু'দিন ভাল করে খাওয়া দাওয়া কর্‌লেই ঠিক হয়ে যাবে। বাংলা দেশের সাহিত্যিকরা—ক'জনই বা পেট পূরে খেতে পায়?" সহধর্ম্মিণীর সহানুভূতি রায় বাহাদুরের মনে সংক্রামিত না হয়ে গত্যন্তর কোথায়? অতএব শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীমতী ঈপ্সিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেক্রেটারী পদে বহাল হ'লেন।

জগন্মোহিনী অর্থাৎ 'ঈপ্সিতা দেবী' অত্যধিক মোটা। তার ওপর হাতে যখন বাতের বেদনা বাড়ে তখন তাঁর পক্ষে উপন্যাস



'সবচেয়ে শঙ্কাজনক তরুণদের সান্নিধ্য'

রচনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি মুখে আওড়াবেন আর সেক্রেটারী সেগুলি লিখে রাখবেন, সেই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা।

তাঁর আগামী বই "মধ্যাহ্নের চাঁদ"। অবৈধ প্রণয় ও তার বাস্তব ফলাফল এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। অতি আধুনিক সাহিত্যিককে সেক্রেটারীরূপে পাওয়ায় লেখিকার কাজ সহজ হয়ে গেল। কিন্তু কয়লার ব্যবসাদার করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ব্যাপারটা ক্রমশঃই জটিল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। দিবারাত্রি কাব্য আলোচনা, তাঁরই বাড়ীতে সাহিত্যিকদের সান্ধ্য-সম্মেলন, তাঁরই টাকায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব, বিভিন্ন সাহিত্য-সংঘে চাঁদা যোগানো অবিরাম গতিতে চলেছে। সব চেয়ে শঙ্কাজনক তরুণ-দের সান্নিধ্য। রায় বাহাদুরের টাকা আছে সত্য, কিন্তু বয়স ত নেই। স্ত্রীর ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ দেখে স্বামী ক্রমশই নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগলেন। ভাবলেন, শেষে কয়লার ব্যবসা গুটিয়ে স্ত্রীর জন্য 'পাব্লিসিটি সিণ্ডিকেট' না খুলতে হয়। 'বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই'—কবি ত বলেই গেছেন।

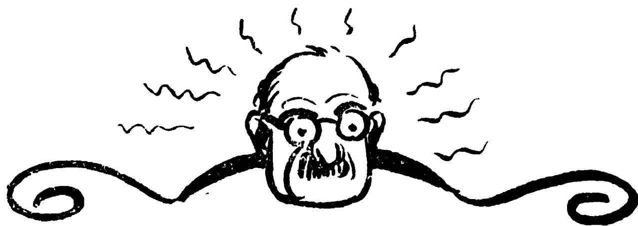
আর এক বিপদও রয়েছে। রায় বাহাদুরের প্রথম পক্ষের কন্যা সরমা নবযৌবনপ্রাপ্তা। রবীন্দ্র-সংগীত, কথাকলি-নৃত্য, মিশ্র-অভিনয় প্রমুখ আধুনিক ফ্যাশন-দুরস্তা মাতা ও কন্যার মাঝখানে পড়ে তরুণ চট্টোপাধ্যায়ের শুষ্ক কেশে রূপালী রং ধরতে লাগল। সে "মধ্যাহ্নের চাঁদ"-এর পাণ্ডুলিপি সাম্‌লাবে, না কুমারী সরমাকে বামপন্থী কবিতার মানে বুঝিয়ে দেবে—এই নিয়ে বেশ সমস্যা দেখা দিল। রায় বাহাদুর জাগ্রত অবস্থায়, শয়নে স্বপনে বিভীষিকা দেখতে লাগলেন। স্রোতের মুখে হাল-ভাঙ্গা তরীর মত মেদবিনির্মিত বপুটিকে এলিয়ে দিলেন। "কয়লা"র বদলে মনে মনে জপ করতে লাগলেন—'আঙ্গিক'

'আঙ্গিক' 'আঙ্গিক' ! বাড়ীর সাহিত্য-সভায় কবি-সাহিত্যিকদের মুখে ঐ শব্দটি তিনি তিন-চার'শ বার শুনেছেন। মানে বোঝেন নি বটে, কিন্তু কানে ভালো লেগেছে !

দিনে-দুপুরে-রাত্রে শ্রীমতী ঈপ্সিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস লেখা চল্‌তে লাগল। কত সাহিত্য-সভা থেকে নিমন্ত্রণ, কত উচ্ছ্বাসপূর্ণ সমালোচনা, দৈনিকে বিজ্ঞাপন, মাসিকে ছবি—চারিদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সাহিত্য-গগনের নতুন চাঁদ ঈপ্সিতা দেবীর নামের পাশে ধ্রুবতারকা তরুণ চাটুয্যের নামও চিক্-চিক্ করতে লাগল। রায় বাহাদুরকে নিয়েও সাহিত্যিকরা টানাটানি করতে কসুর করলেন না। চেক্ বইয়ের পাতাও দু একখানি করে কমতে লাগল। প্রবাসী সাহিত্যিকরা এসে তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীর শোভাবর্দ্ধন করতে দ্বিধা করলেন না। "ভেরামন" ট্যাবলেট খেয়েও করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোর নিদ্রাকর্ষণ-চেষ্টা বিফল হল !

ক্রমে সাহিত্যরসিকা কন্যা সরমার বিবাহ-চিন্তা কয়লা-ব্যবসায়ী রায় বাহাদুরকে আরো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুল্‌ল। মোজাপরা সাহিত্যিক তরুণ চাটুয্যে তাঁকে স্ত্রীসঙ্গে বঞ্চিত করেছে বল্‌লেই হয়—শেষে এই হতভাগা মেয়েটারও কি সর্বনাশ করে ছাড়বে ? ভাবতেও ভয় হয় ! কিম্বা লপেটামার্কা বাঁকা ধনুকের মত কোনো অতি-আধুনিক কবির গলাতেই না সরমা মালা দিয়ে বসে ! মান-মর্য্যাদা আর থাকবে না দেখছি !

রায় বাহাদুর ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন,—পাত্রের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু 'বক্স নম্বার' দিলে আবার হয়ত কেউ তাঁরই প্রশংসা পত্র সহ আবেদন করে তাঁকে বিভ্রান্ত করে তুল্‌বে। তাতে কাজ নেই। নাম দিয়েই করবেন ; এবং একমাত্র সর্ত থাক্‌বে—পাত্র যেন জীবনে সাহিত্য-চর্চ্চা না করে থাকে ! আইডিয়াটা রায় বাহাদুরের নিজের কাছেই খুব ভাল লাগল।



আন্এমপ্লয়মেন্ট



কৈশোরে নুটবিহারীর মটো ছিল, "বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"। যৌবনোদ্গমে সেটি রূপান্তরিত হ'ল প্রোফেশনে। আর যৌবন যখন যায় যায় তখন ধর্মতলার ধর্মপ্রাণ জ্যোতিষীর পরামর্শে সে স্থির করে ফেল্‌ল, চাকরীই তার উপযুক্ত জীবিকা। চাকুরীর স্থানে বৃহস্পতির জাজ্বল্যমান দৃষ্টি থাকায় "তদধং রাজসেবায়াং" এর প্রতি ভ্রূকুটি, ভালবাসায় পরিণত হ'ল। কিন্তু সমস্যা হ'ল রাজসেবা করতে চাইলেই ত আর রাজা বাহাদুর পা দুটি এগিয়ে দেবেন না! হাতড়াতে হ'বে।

গত সাত বছর ধরে আমাদের নুটু-দা আলোয়-অন্ধকারে দু'হাত বাড়িয়ে হাতড়েছেন; কিন্তু অফিস-রুমের পালিশ

করা দরজার সম্মুখভাগ ছাড়া সে-হাতে আর কিছু ঠেকেনি! নিয়মিত দরখাস্তের কল্যাণে আয় বাড়িয়েছেন ডাকঘরের, নিজের নয়! মাঝে মাঝে মনে হয়েছে—দুর ছাই, আবার লক্ষ্মীর সাধনাই সুরু করে দেওয়া যাক্, কিন্তু রাশিচক্রের গণ্ডীর বাহিরে পা বাড়াতে সাহস হয়নি। একদিন ট্রামে নুটুদার সঙ্গে দেখা। বল্লুম, এত লোক মিলিটারীতে চাকুরী পাচ্ছে, আর আপনি বসে রইলেন। পারমার্থিক হাসি হেসে তিনি বল্লেন—"প্যাণ্ট পরবার বয়েস কি আর আছে ভাই? ছোটবেলায় ডাংগুলি খেলার পর ও-অসভ্য পোষাক আর পরিনি। চাকরী একটা পাবই। তবে গ্রহের ফেরটা না কাটলে ত নয়"। এই বলে তিনি শনির বক্রীস্থান, মঙ্গলের অন্তর্দশা, বিংশোত্তরী অষ্টোত্তরীর পার্থক্য প্রভৃতির মার-প্যাঁচ সম্বন্ধে এমন বক্তৃতা সুরু করলেন যে ট্রামের ভিড়টা ক্রমঃশই আমাদের দিকে কেন্দ্রীভূত হ'তে লাগল। চট্ করে দরজা দিয়ে গলে গন্তব্য স্থানের আগেই রাস্তায় নেমে পড়লুম।

তারপর অনেকদিন নুটুদাকে দেখিনি। আমাদের সন্দেহ ছিল নিশ্চয়ই তাঁর কিছু পৈত্রিক টাকা আছে, নইলে যাহোক্ চাক্রী কি একটা তিনি জোটাতে পারেন না। অবশ্য উঁচুদরের চাকরী না হ'লে তাঁর মন উঠবে না, এটাও ঠিক কথা। যাই হোক্ নিজের জীবন-সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় নুটুদার কথা ভাববার সময় পাইনি অনেক দিন। এদিকে বাংলায় দুর্ভিক্ষ এলো, আবার চলে গেল—যাবার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল, ফিরে আসবার। দিনের পর দিন মৃত্যু দেখতে

দেখতে, কঠিন মন কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। বুভুক্ষুর মুখের গ্রাস লুকিয়ে রেখে আমরা কোনমতে বেঁচে রইলুম।

আমাদের অফিসে একটা ভেকেন্সি হতেই মনে পড়ল ন্যুটুদার কথা। অনেককাল পরে তাঁর বাড়ীর দরজায় এসে টোকা মারলুম। ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকিতে সুবিধা হ'ল না দেখে বাড়ীর পিছন দিকে গেলুম। দেখলুম খিড়কির দরজায় তালা লাগানো! পাড়ার লোকের কাছে শুনলুম, বছর খানেক হ'ল স্ত্রীপুত্রদের দেশে পাঠিয়ে ন্যুটবিহারীবাবু নাকি চাকরীর খোঁজে কোথায় চলে গেছেন! ইদানীং তাঁর মাথায়ও একটু গোলমাল দেখা দিয়েছিল।

ক'দিন থেকে আমার বন্ধু যতীনের বড় বাড়াবাড়ি অসুখ যাচ্ছিল। কাল রাত্রে ওদের বাড়ীর চাকর এসে খবর দিল, শ্মশানে যেতে হবে। প্রায় ভোর রাত্রিতে আমরা নিমতলার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলুম। যতীনের সঙ্গে অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। মনটা বড় ভারী হয়ে উঠেছিল। কাঠ-ঘি-চন্দন কেনবার ব্যাবস্থা করে, অন্যদের উপর এটা-ওটা কাজের ভার দিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলুম। অনেক পুরানো স্মৃতি মাথায় পাক খাচ্ছিল। হঠাৎ অতীনের ডাকাডাকিতে চমক ভেঙ্গে গেল। অতীন যতীনের ছোট ভাই। "একবার এদিকে আসুন, দাদা"—বলে সে আমায় টেনে নিয়ে গেল! গিয়ে দেখি একটি প্রৌঢ় অর্দ্ধোন্মাদকে ঘিরে অনেকেই ভিড় করে

দাঁড়িয়েছে। মুখটা চেনা মনে হল ? একি ! এ যে আমাদের নুটুদা। এমন চেহারা কি করে হল। গায়ে ধূলো, একমুখ দাড়ী, পরণে শতছিন্ন কাপড়। এগিয়ে যেতেই বুঝলুম আমায়



'মুখটা চেনা মনে হ'ল'

চিনতে পেরেছেন। নুটুদা লজ্জায় মুখখানা কেন নীচু করে রইলেন বুঝলুম না। আমি ঈষৎ হেসে বললুম—কি নুটুদা, শেষে চাকরীর খোঁজে আপনাকে শ্মশানঘাটে আসতে হ'ল ? ধর্ম্মতলায় যার আরম্ভ নিমতলায় তার পরিণতি ? নুটুদা আমার হাতটা ধরে বল্লেন, "ঠাট্টা করছ বটে, কিন্তু ভেবে দেখ ত আমার বুদ্ধিটা ঠিক কি না। ভেকেন্সির খবর এখানে যে রকম সঠিক পাওয়া যাবে আর কোথাও

নয়। বিজ্ঞাপন, উমেদারী যাই বল, এইখানে কমপিটিশন্ সব চেয়ে কম। কে মরল এবং সে কোথায় চাকরী করত, এই খবরটা জোটাতে পারলেই সোজাসুজি গিয়ে বড় সাহেবকে ধর। বাস্, খালি সীটে তোমায় বসিয়ে দেবে। তবে বুড়োরা ভুগে মরে, তারা এখানে আসবার আগেই শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যায়। তোমার বন্ধুটি কি ইয়ং ম্যান, না বৃদ্ধ হে ?"

বুঝলুম নুটুদার সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। অতীন কানে কানে জিজ্ঞেস করল, "পুলিশের স্পাই না কি ? দাদার খবর এত জিজ্ঞেস করছে কেন ? চেনেন না কি এঁকে ?" উত্তর দেবার আগেই দেখি শ্মশানঘাটের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে আসতে দেখে নুটুদা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে সুরু করেছেন। ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে বল্লেন, "এ পাগলটা অনেকদিন ধরে এখানে জ্বালাচ্ছে। সবাইকে ও এক প্রশ্নই করে - মৃতব্যক্তি চাক্‌রী করত কোথায় ? আর কোনো গণ্ডগোল নেই। আমাকে ভয় পায়, দেখলেই পালায়। আবার জ্বালাতন করতে এলে আমার নাম করে ভয় দেখাবেন, চলে যাবে। গারদেও নিতে চায় না, বলে মাথার কোনো বিকৃতি নেই। কি যে করি। আচ্ছা, নমস্কার"।

ভাবতে লাগলুম—পাগল আর সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যবধান কতটুকু, আর তার সীমারেখা কোথায় ?



প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, "পাশবিক" শব্দের সদর্থ—পশু সম্বন্ধীয়। কদর্থ—অমানুষিক। মনুষ্য সমাজে পাশবিক কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তার প্রবল প্রতিবাদ করিয়া পশু-আইনসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত যে প্রস্তাবটি সভাপতি প্রেরণ করিয়াছেন তৎপ্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পশুসমাজ হইতে মানুষিক অত্যাচারের সংবাদও আসিতেছে।

সম্প্রতি বড়লাট মহোদয় ঘোষণা করিয়াছেন,—"পাশবিক পার্টিশন কাউন্সিল দু'জন হিন্দু পশু ও দু'জন মুসলমান পশু লইয়া গঠিত হইবে। চেয়ারম্যান (চেয়ার এ্যানিম্যাল?) হইবেন পশুরাজ সিংহ। ইঁহারা বঙ্গদেশের যাবতীয় পশু সমাজকে দুইটি সম্প্রদায়ে ভাগ, তাদের সম্পত্তি বিভিন্নকরণ ও বাসস্থানের সীমানির্দ্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন। ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বেই এই কাজ শেষ করিতে

হইবে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় প্রত্যহ কাউন্সিলের অধিবেশন বসিবে। এই সূত্রে হিন্দু পশু ও মুসলমান পশুর তালিকার জন্য ১নং সিডিউল দ্রষ্টব্য।"

চিড়িয়াখানায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সুদূর আফ্রিকা হইতে আগত বৃটিশ সিংহ হুঙ্কার ছাড়িয়া সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়াছেন। সুন্দরবনের "রয়াল বেঙ্গল" ও স্বাধীন হিমালয়ের ভল্লুক—এই দুইজন হিন্দু সদস্য। গণ্ডার ও হিপ্পোহাতী পাকিস্থানের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। হিন্দু ও



হিন্দু ও মুসলমান এলাকার বাঁদররা

মুসলমান এলাকার বাঁদররা এতদিনে একত্রে একই পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিল। আজ তাদের বিতর্ক-কিচিমিচিতে কান পাতা ভার। বাংলা ভুলিয়া উর্দ্দু ও হিন্দীতে তাহারা পরস্পরকে

গালিগালাজ করিতেছে। সর্পদল ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছে—কারণ তৃতীয় ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের বসবাস সর্ব্বত্র। পক্ষীকুল ভাবিয়া আকুল—আকাশমার্গে পাকিস্থানের সীমানা কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? "ইষ্ট বেঙ্গল মেল" পূর্ব্ববঙ্গ পার হইলেই "আসাম মেলে" রূপান্তরিত হইবে, কিন্তু পাখীদের পক্ষ-চালনা হঠাৎ কোথায় থামাইতে হইবে সে এক কঠিন সমস্যা। হিন্দুস্থানের পাখী বিনা-অনুমতিতে পাকিস্তান-বাগানে উড্ডীন হইলেই অবিলম্বে তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিবে। পাকিস্তানী শিকরে বাজ হিন্দুস্থানে আসিলেই হয়ত তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া ভারতীয় চিড়িয়াখানায় রাখিয়া দিবে। বহু শীলমোহর-করা মেমো-র‍্যাণ্ডাম পশুরাজের টেবিলে জড় হইয়াছে। হিংস্র পশুরাও হিংসা ভুলিয়া ভদ্রবেশে আলিপুরে আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছেন। সারি সারি বেঞ্চির দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন—সাপের পাশে ব্যাঙ, বিড়ালের পাশে মাছ, বাঘের পাশে হরিণ, টিকৃটিকির পাশে ফড়িং নির্ভয়ে সমাসীন। ভাগাভাগির গুরুত্বের কথা ভাবিয়া আজ তাহারা শংকাকুল চিত্তে বিমর্ষ মুখে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছে।

সভা আরম্ভের ঘণ্টা বাজিল। পশুরাজ সিংহের দক্ষিণ পার্শ্বে ব্যাঘ্র ও ভল্লুক—বাম পার্শ্বে গণ্ডার ও হিপ্পোহস্তা। পটভূমিকায় বাংলাদেশের মানচিত্র। সমবেত পশু-পক্ষী প্রত্যেকের হস্তে ও চঞ্চুতে ১নং সিডিউল শোভা পাইতেছে। সিংহ মহাশয় উদ্বোধনী বক্তৃতা সুরু করিলেন।

"প্রিয় পশুপক্ষীগণ, আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছি। এতদিন বনভূমিতে রাজত্ব করিয়া ক্লান্তিও আসিয়াছে। অতএব তোমরা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র রাজ্য রচনা করিয়া সুখে কালাতিপাত কর, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। সেই সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আজ এই বিস্তীর্ণ বনভূমি তোমাদের বাঁটিয়া দিব, স্থির করিয়াছি; হিন্দু পশু-সভা, মুস্লিম পশু-লীগ, নবীন-বঙ্গ পশু-সমিতি, তপশীলী পশু-সঙ্ঘ, পাক্ষিনী এ্যাসোশিয়েশন, উভচর পার্টি প্রমুখ প্রধান-অপ্রধান সমুদয় দলই সমবেত হইয়াছে দেখিতেছি। বহি-ভারতবাসী পশুপক্ষীরা এই বিভাগ-ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ থাকিবেন। (অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে তাঁহারা স্বার্থসংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দলের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন।) অতএব বন্ধুগণ, তোমাদের মধ্যে কোন্ দল সর্ব্বাগ্রে দরখাস্ত দাখিল করিবে তাহাই স্থির কর। পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টি লইয়া আমি এযাবৎ আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছি। আজিও বিদায়ের প্রাক্কালে তাহার অন্যথা ঘটিবে না। ঈশ্বরের নাম লইয়া এই মহৎ কর্ম্ম সুরু—"

হঠাৎ বিকট অট্টরোল সুরু হইয়া গেল। ব্যাঘ্রের গর্জ্জন, গণ্ডারের তীব্রনিনাদ, হস্তীর বৃংহতি, জিরাফের আর্ত্তস্বর, বানরের প্রলাপ, পক্ষীর কোলাহল সব মিলিয়া আণবিক বোমা বিস্ফোরণের আবহাওয়া সৃষ্ট হইল। রিপোর্টারের গ্যালারি হইতে লাঙ্গুল তাড়না, পক্ষ-বিধূনন, নখরাঘাত, দংশনের চরম অভিব্যক্তি দেখিতে লাগিলাম। ব্যাপার আর কিছুই নয়! কে আগে আর্জ্জি পেশ করিবে ইহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে মারা-

মারি-কাটাকাটি লাগিয়া গিয়াছে। **শুধু** হিন্দু-পশু মুসলমান-পশুর মধ্যে নয়; তাহাদের নিজেদের মধ্যেও মতান্তরের অন্ত নেই। পলকের মধ্যে আলিপুর চিড়িয়াখানায় রক্তের নদী বহিতে লাগিল। · প্রাণ লইয়া চম্পট দিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম—চেয়ার-এ্যানিম্যাল সিংহ মহাশয় শ্বেত ভল্লুক, শ্বেত ময়ূর, শ্বেত হস্তী প্রমুখ বিদেশী ও বিদেশিনীদের আড়ালে ডাকিয়া উচ্চহাস্য সহকারে বলিতেছেন,—"দেখলে ত, একচালে বাজীমাৎ! মরুক এরা লড়াই করে। আমি কায়কল্প-চিকিৎসার আয়োজন করি! আরো কিছুদিন রাজত্ব করতে হবে ত? কি বল, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, !!!"

তিন লাফে গেটের বাহিরে আসিয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিলাম। হাঁটিয়া গিয়া ট্রাম বা বাস ধরিবার সাহস ছিল না!





'বিচিত্র স্বর্গে'র সম্পাদক বল্‌লেন, "আপনার রচনার মধ্যে যে আজকাল 'হিউমার' খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ব্যাপার কি?" প্রশ্ন শুনে রাগ বা অভিমান কিছুই হ'ল না, শুধু বিস্মিত হলাম। অবশ্য আমরা যখন গয়লাকে বলি—'দুধে জল ঢাল্‌চ' এবং রেশনশপের ম্যানেজারকে প্রত্যেক সপ্তাহে শোনাই—"মশাই, চালে বড় কাঁকর হচ্ছে!"—তাঁরা বিস্মিত হ'ন না কৃপাকটাক্ষ করেন; অতএব আমারও বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত ছিল না। যাই হোক, ভাবছিলাম—সম্পাদক মশাই কি "প্রাক্‌-প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের" যুগে বাস করছেন? বছরখানেক ধরে কে কা'কে ভবসাগর পারে নিয়ে যাবে তার কম্পিটিশন চল্‌ল; তারপর কালনেমির লঙ্কাভাগ; যত্র তত্র 'পরোক্ষ' সংগ্রামের আত্ম-প্রকাশ; দুর্ভিক্ষের আসন্ন ছায়া; তা ছাড়া বাড়ীওয়ালার আদর-আপ্যায়ন, ট্রামে-বাসে পকেটমারের প্রাদুর্ভাব, কলেরা-বসন্ত-ম্যালেরিয়া, মন্ত্রীসঙ্কট—সর্ব্বোপরি মোক্ষম সময়ে

মহা-মানবের মহাঅন্তর্দ্ধান! হাস্‌বার বা হাসাবার জো আছে কি? তবে একজন আমাদের এই নিদারুণ দুর্দ্দশা দেখে হাসচেন বৈ কি! তিনি স্বয়ং বিধাতাপুরুষ। কী রসিকতাটাই না করলেন আমাদের সঙ্গে! কিউ দিয়ে দোকানে দাঁড়াও, পাড়া থেকে গুণ্ডা তাড়াও, বাড়ীওয়ালার ভাড়া বাড়াও, বাসে উঠতে ধাক্কা খাও, চাকর খুঁজতে মফঃস্বলে যাও, ব্যবসাদারদের সেলামী দাও—আরো কত বল্‌ব? এই আদি-অন্ত-বিহীন পুরুষটির সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে পারলে 'বিচিত্র স্বর্গে'র সব ক'টা পৃষ্ঠা আমি একাই স-রস করে তুল্‌তে পারি! রসো বৈ সঃ—ছাত্রাবস্থায় পড়েছিলুম বটে, কিন্তু বিদেশী শিক্ষার মোহে পড়ে রস খুঁজেছি বিলাতী মাসিকের পাতায়, আর হেসেছি লরেল-হার্ডির ভাঁড়ামি বা ঘোড়ামি (horse-play) দেখে কিংবা ফরাসী সাহিত্যের (gallic wit) চাট্‌নি চেখে!

যাক্ যা বল্‌ছিলাম! সম্পাদক মশাই বল্‌লেন, যদি নিজেকে দেখে হাস্‌তে পারেন তবেই বল্‌ব আপনি সুরসিক! লিখতে বস্‌বার আগে একবার বড় আয়নাটার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম, এককালীন পুরুষ্টু গাল দুটির হাড় ঠেলে উঠেছে, দাড়ির উন্নতশির মূল গুলি বামপন্থীদের মতই মারমুখী, চশমার নীচে অতি-পরিশ্রমে নিষ্প্রভ চোখের তারা দুটি পাথরের বলে ভ্রম হয়, আর মাথায় ত' সহস্র ঝড়-ঝাপটার চিহ্ন বর্ত্তমান। হাসি ত দূরের কথা, ছোট মেয়েটার কান্না শুনে অন্যমনস্ক না হয়ে গেলে নিজের চেহারা দেখে নিজেই হয়ত কেঁদে ফেল্‌তাম।

কিন্তু আপ্তবাক্য সফল করা প্রত্যেক সাহিত্যিকের অবশ্য কর্ত্তব্য। কবি বলেছেন, "এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা!"



'আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম'

সেই অনুপাতে দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে ত রঙ্গরসের প্লাবন বয়ে যাওয়া উচিত। হয়ত বইছেও—আমরা জানতে পারছি না! তবু সংশয় দূর করবার জন্য অভিধানটা খুলে বস্‌লাম। Humour-এর অর্থ—Sense of fun! Skin affection! a fluid of body. ব্যস্! এইবার পরিষ্কার হয়ে গেছে! আসল কথা শরীরের রস শুকিয়েচে বলে মনেও রস নেই। অতএব শরীরটাকে রসস্থ করবার উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে সবাইকেই যে 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস' হ'তে হবে। চন্দননগরও আবার ভারত ইউনিয়নের মধ্যে ঢুকল। ব্যাপার বড় সঙ্গীন। ..বাংলা অভিধানটা এবার দেখা যাক্! হাসির রকম ফের শুনুন—

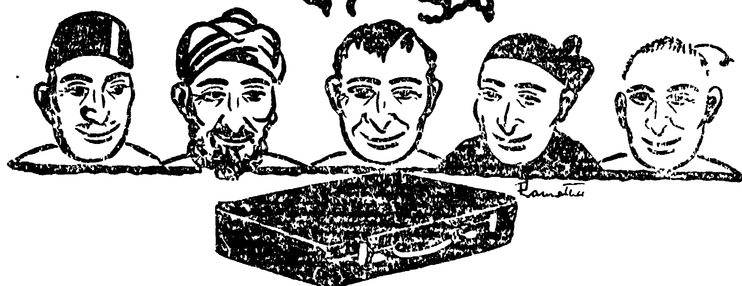
কাষ্ঠ হাসি, দেঁতো হাসি, অট্টহাসি, মিচকে হাসি, মৃদু হাস্য, বক্র হাস্য, পৈশাচিক হাস্য—বাপরে বাপ! হাসির ফিরিস্তি শুনে মাথা ঘুরে যায়! কিন্তু আমার দরকার সরল, সোজা, নির্ভেজাল হাসি। হাস্যরসিক এক বন্ধু ঘরে ঢুকে বল্লেন—"তুমি ক্ষেপেছ নাকি? ভেজাল-বিহীন ভগবানকেই খুঁজে পাবে না, ত হাসি!" ঠিক কথা! যে যুগে—দুধে জল ছিল না, মানুষ সদা সত্য কথা কইত, দাঁড়ি-পাল্লা সমান থাকৃত, বাটখারায় পূরো ওজন ছিল—সে যুগের হাস্যরসাত্মক কাব্যসাহিত্যের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমার গতি নেই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বই খুল্লাম। আহা হা! প্রথমেই চোখে পড়ল—"শুধু খায় পেট ভরে' পাঁঠারাম দাদা! ভোজনের কালে যদি কাছে থাকে বাঁধা।" শুধু কি হাস্যরস? জীবে প্রেম এবং নামে রুচি—দুই-ই সমপরিমাণে বর্ত্তমান। সমালোচক নাক সিঁটকে বল্লেন—"এ যুগে ও-সব অচল!" মনে মনেই ভাবলাম,—দাদার নিশ্চয়ই ডিস্‌পেপসিয়া আছে। রস পরিপাকের ক্ষমতা হারালে কি আর রস-বোধ টিকে থাকতে পারে?...হুতোম প্যাঁচার নক্‌সাখানা টেনে বার করতে যাব, দেখি আলমারী আলো করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বার্ণার্ড শ। দুজনকেই নামালাম। হঠাৎ কানের পাশ থেকে বৃদ্ধ নাট্যকারের গলার আওয়াজ শুন্‌লাম "খুলো না আমার বই! বুদ্ধিহীনেরা এ বই পড়ে হাসে। বর্ত্তমান যুগের দুঃখময় সভ্যতার ইতিহাস ছাড়া এ আর কিছু নয়!" সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলাম, "তবে প্রকৃত হাসি বলে কি কিছু নেই?" উত্তর

এল "আছে। সে শুধু পুণ্যবানের মুখে, তোমার আমার নয়! —বাজারে যা দেখচ—সবই conditioned reflex!" আশ্বস্ত হলাম। তাহলে শুধু আমিই অপরাধী নই! শ্লেষাত্মক হাসির রাজা স্বয়ং আমাদের দিকে।

যাই "বিচিত্র স্বর্গের" সম্পাদক-মশাইকে কথাটা বলে আসি। Man is a laughing animal—এই সংজ্ঞাটি পালটাতে হবে। এতদিনে ঢাকা শহরের গাড়োয়ানের কথাই তো সত্য হ'ল। রমনা যাবার ভাড়া দেড় টাকা বলেছিলুম বলে সে জবাব দিল—"আইস্তে কন্ কর্ত্তা—গুরায় হাসব!" অর্থাৎ ঘোড়া এই অল্প ভাড়ার কথা শুনে হাসবে। তবে গাধা-ঘোড়া-ভেড়া এরাই এবার হাসুক এবং হাসাক। আমরা শুধু অতীতের রঙ্গরসের কথা স্মরণ করে দুনয়ন ঝাপসা করে ফেলি!!





বুদ্ধিমান ও ব্যবসায়ী লেখকের মত গল্পের ছলে বাক্সের বিজ্ঞাপন দেবার অভিপ্রায়ে এ কাহিনীর অবতারণা নয়। সে ইচ্ছা থাকলে অল্পবুদ্ধি পাঠকদের ঠকাবার জন্য এই রচনার "মেক্-আপ" বা "রহস্য-ভেদ"—ঐ জাতীয় কিছু নাম রাখতাম। জাত-লিখিয়েদের মত বানিয়ে বলার অভ্যাসও আমার নেই। 'বাক্স' সম্পর্কে একটি খাঁটি সত্য কাহিনী আপনাদের শোনাব।

চামড়ার একটি ছোট্ট ব্যাগ—চল্‌তি ভাষায় আমরা বাক্সই বলি। এই বাক্সের সত্বাধিকারী, শ্রীমান্ কালাচাঁদ। কালাচাঁদ আমাদের গ্রামের ছেলে। ছোট বয়সে যাত্রাদলে সখীর পার্ট করেছে, বড় হয়ে পূজোর থিয়েটারে 'সাজাহান' সেজেছে। অভিনয়ের চাপে আর লেখাপড়া হয়ে ওঠে নি। তারপর যুদ্ধের বাজারে কালাচাঁদ শহরে এল। হঠাৎ একদিন দেখলাম, খাকি শার্ট আর হাফ্‌প্যাণ্ট পরে কালাচাঁদ কালাপানি পার হ'বার চেষ্টা-চরিত্র করছে। কথাবার্তায় বাংলার চেয়ে ইংরাজি বুলিই কাণে এল বেশি। মিলিটারীর কৃপায় উচ্চারণও সে দুরস্ত করে নিয়েছে। শুধালাম,—কিসের

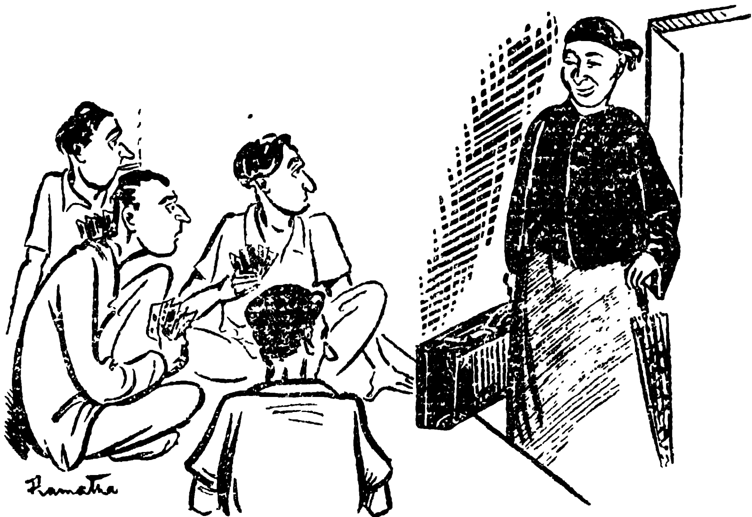
চাক্‌রী হে কালাচাঁদ? সে একগাল হেসে বল্‌লে, "রতনদা, একটা ডান্স পার্টির সঙ্গে যাচ্ছি সোলজারদের এন্‌টারটেন করতে হ'বে। এখন সাড়ে তিনশ করে দেবে, এক বছরের কন্‌ট্র্যাক্ট! প্রথম বার্মা ফ্রণ্টে যাব, তারপর নর্থ আফ্রিকা— সেখান থেকে য়ুরোপের সেকেণ্ড ফ্রণ্টে।" সেই কালাচাঁদ? 'ডান্স' আর 'ফ্রণ্টে' তালগোল পাকিয়ে আমার মাথার মধ্যে তখন 'ফক্স ট্রট্' সুরু হয়ে গেছে। এই কালাচাঁদ পাঠশালে 'চর্ব্বণ' মানে 'চর গাছের বন' বলায় সাড়ে তিন ঘণ্টা থান ইঁট হাতে করে 'নাড়ুগোপাল' হয়ে থেকেছিল। 'মেবার-পতন' অভিনয়ে 'হস্তস্থিত তরবারি' বল্‌তে গিয়ে বার তিনেক "হস্ থস্ থস্ থস্" বলে থেমে যাওয়ায় সেবার যবনিকা টেনে মান বাঁচাতে হয়। সেই কালাচাঁদ? কন্টিনেণ্টে যাবে ভারতীয় নৃত্যের exponent রূপে?

নাচই বা শিখ্‌ল কবে? একটু সাম্‌লে নিয়ে সেই প্রশ্নটা কর্‌লাম। শুনলাম, এক মার্কিণ সেনা তাকে ভারতীয় নৃত্যে দীক্ষা দিয়েছে। শুনে শ্রবণ ধন্য ও পরিতৃপ্ত হ'ল। এর পর যদি শুনি শ্রীমান্ কালাচাঁদ বিলেতে গিয়ে বার্ণার্ড শ'কে ফ্রেঞ্চ্ শেখাতে সুরু করেছে কিছুমাত্র আশ্চর্য হ'ব না! There are more things in heaven and earth··

এর পর আর বছর তিনেক কালাচাঁদের সঙ্গে দেখা হয় নি। এদিকে সব 'ফ্রণ্টে'ই যুদ্ধ থেমে গেছে। আণবিক বোমার

আঘাতে হিরোশিমা, নাগাসাকি থেকে আরম্ভ করে আমাদের পাড়ার খাঁদা, গিরিধারী মিস্ত্রী, সহিস রহিম শেখ্ সবাই ভূপাতিত হয়েছে। খাকি স্যুট শতছিন্ন, ট্যাঁকে টাকার বদলে চেয়ে চিন্তে নেওয়া আধপোড়া বিঁড়ি—যুদ্ধ-ফেরৎ হঠাৎ-মিলিটারী বাবুরা কেউ গৃহহীন, কারু বা 'পাইস হোটেল' ভরসা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বৈঠকখানায় দিব্যি আডডা জমেছে। চা-চুরুট এবং চৌতালে ধামার চলেছে পুরোদমে। এমন সময় শ্রীমান্ কালাচাঁদের আকস্মিক আবির্ভাব। চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে দিল। বর্মী লুঙ্গি পরে ফুঙ্গি সেজে অপরূপ পোয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে যুদ্ধ-ফেরৎ কালাচাঁদ



'লুঙ্গি পরে' ফুঙ্গি সেজে'

একটা রীতিমত 'ক্যাপিট্যাল' পোজ্ মারল। ছোটবেলা থেকে

দেখে আসছি—তাই চিনে ফেল্লাম। নইলে ধরে কার সাধ্য? বিমল সুরে বলে উঠল—"কালাচাঁদ, তুমি কি বেশে এসেছ—" গোলমাল থামিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম—"ব্যাপার কি হে? একেবারে বার্মা ফ্রন্টের ষ্টেজ থেকে নেমে এলে নাকি?" কালাচাঁদ গম্ভীর মুখে বসে পড়ল। লক্ষ্য করলাম, তার হাতে একটি ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ। সে মুরুব্বির চালে বললে—"তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, ইণ্ডিয়াতে শীগগির একটা 'সিভিল ওয়ার' লাগবে। অস্ত্রশস্ত্র এখন থেকেই যোগাড় কর। নইলে এ যাত্রা রক্ষা পাবার আশা খুব কম।"

কালাচাঁদের কি মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল? সেদিন ১৯৪৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী। কোনো দিগন্তেই যুদ্ধের ছায়া নেই। আর নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে পরস্পরের গলা কাটার কল্পনা করাও পাগলামি! শুধালাম, "কালাচাঁদ, একি তোমার War secret? যুদ্ধ ত কবে মিটেছে—এখনও তুমি, লরেল-হার্ডির মত যুদ্ধের স্বপ্ন দেখছ নাকি? সে গম্ভীরতর মুখে উত্তর দিল—"না রতনদা, ইয়ার্কি নয়। ব্রহ্মদেশে থেকে ঘরোয়া যুদ্ধের যা নমুনা দেখে এসেছি তা ভয়াবহ। এখানে সে রকম সুরু হলে কত নিরীহ প্রাণী যে মরবে তা কল্পনা করা যায় না। যাক্, আমি উঠি। পার্ক সার্কাসে একটা এ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে।"

এর কিছুদিন পরেই এল ১৬ই অগাষ্ট। কালাচাঁদ জ্যোতিষ

শাস্ত্র শিখেছে, না চার্চিল গ্রুপে জয়েন্ করেছে ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। পূজোর ঠিক আগেই সে একদিন এসে হাজির। পরম বৈষ্ণবের মত চেহারা, ফোঁটা-তিলক, কণ্ঠী কিছু বাদ নেই। আগের মত হাতে ব্যাগটি ঠিকই আছে। জিগেস করলাম ব্যাপার কি ? সে বল্‌ল, "বড্ড busy. Order Supply এর কাজ নিয়েছি—দম ফেলবার সময় পাচ্ছি না।" আমি বল্‌লাম, "এ বেশ কেন ?" কালাচাঁদ সহাস্যে উত্তর দিল—"দাঙ্গার সময় তোমাদের পাড়ায় কি পাজামা পরে আসব ?" কথাটা ঠিক ! তবুও কালাচাঁদ সবেতেই একটু বাড়াবাড়ি করে বলে মনে হ'ল। সেদিন সে হঠাৎ সরে পড়ল। কিসের order supply করে তা আর জানা গেল না।

দাঙ্গায় দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুবান্ধব অনেককেই হারিয়েছি। গিন্নীকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে আলু ভাতে-ভাত রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছি। ঠাকুর্দার আমলের বাসন-কোসনের মায়ায় গুণ্ডা-মার্কা পাড়ার ছেলেদের ভরসায় শেষ পর্যন্ত বাড়ী আগলে ছিলাম। তারপর মূর্তিমন্ত শান্তির দেবতা গান্ধীজী এলেন কল্‌কাতায়। শহরের হিন্দু-মুসলমান হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ১৪ই অগাষ্ট রাত্তিরে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে আমিও কলাবাগানে ঘুরে এলাম। পরদিন কবি-বন্ধু শওকৎ আলি আমার বাড়ীতে এসে গিন্নীর হাতের রাঁধা পরমান্ন খেয়ে গেল।

হঠাৎ শান্তির সূর্যালোকের ওপর কার দুরভিসন্ধি ক্ষণিকের জন্য বিরোধের মেঘ ছড়িয়ে দিল। স্বাধীনতা-লাভের অমৃত দু'দিনে পচে ভেপ্‌সে উঠল। সেদিন সন্ধ্যায় 'শান্তিসেনা'র শোভাযাত্রা থেকে ফিরে বিমল বল্‌ল—"রতন, চিৎপুর দিয়ে আমরা যখন যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি উত্তেজিত মুস্‌লিম জনতার মধ্যে কালাচাঁদ লুঙ্গি পরে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ বড়ই দাড়ি গজিয়েছে—হিন্দু বলে চেন্‌বার উপায় নেই। চোখে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিল। ব্যাপার কি বল্‌তে পার ?" দাঙ্গার সময় কালাচাঁদ মুসলমান সেজে চিৎপুরে বাস করছে—এতখানি বুকের পাটা তার কেমন করে হয় ? ভেবে-চিন্তে কিছুই কূলকিনারা করতে পারলাম না। ...যাক্ বিংশ শতাব্দীর দধীচির অনশন ব্রতের ফল স্বরূপ আবার হারাণো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল কল্‌কাতার বুকে। নিয়ম মাফিক্ জীবনযাত্রা সুরু হয়ে গেল কেরাণী, ছাত্র, মজুর, ধনীর ঘরে ঘরে। এক বছরের দুঃস্বপ্ন হঠাৎ একদিন ভোরের আলোয় মিলিয়ে গেল শূন্যে।

সেদিন সকালে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। সিনেমায় থার্ড ক্লাশের এড্‌ভান্স বুকিং বন্ধ হয়ে গেল। বাঁচা গেছে। পয়সাও বাঁচবে আর গিন্নীর আব্‌দার রাখ্‌তে গিয়ে অডিটোরিয়ামের মধ্যে পুত্রকন্যাবাহিনীর কান্নার জ্বালায় দর্শকের অভিশাপও কুড়োতে হবে না।...এ হেন সময়ে শ্রীমান কালাচাঁদ মালাকারের আবির্ভাব। খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবি, খদ্দরের টুপি—কিন্তু হাতে সেই eternal চামড়ার ব্যাগ।

বহুরূপী কালাচাঁদের প্রতি কেন জানি একটা বিতৃষ্ণা এসেছিল। হয়ত পুলিশের স্পাই, নয়ত আর কিছু। দরকার কি এসব লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে? এ আপদ বিদায় হলেই ভাল।

কালাচাঁদের মুখে একটু কাঁচু মাচু ভাব। আমার হাত দুটো ধরে বলে উঠল—"অপরাধ নেবেন না, রতন-দা! Order Supply এর কাজ। নানা জায়গায় যেতে হয়। কি করি বলুন? হিন্দু-মুসলমান শিখ সব রকমই সাজতে হয়।" এই বলে সে তার রহস্যময় বাক্সটির ডালা খুলে ফেলল। তাতে হরেক রকমের মেক্-আপের ব্যবস্থা। মুসলমানের নুর, হিন্দুর টিকি, শিখের চাপ দাড়ি, উড়িয়ার ঝুঁটি, মাড়োয়ারীর পাগড়ি—কিছু আর বাদ নেই। বললুম, "কালাচাঁদ, হিন্দু-মুসলমান ত বুঝলাম, কিন্তু উড়ে মেড়ো শিখের ব্যাপারটা কি?" সে বললে, "ইণ্টার-কমুনাল সিভিল ওয়ারের পরই ত ইণ্টার-প্রভিন্সিয়াল ওয়ারফেয়ার! ভবানীপুরের বাস ড্রাইভারদের কাছে order supply করবার দরকার হলে শিখের মেক্-আপ চাই। বাঙালী-উড়িয়া গোলমালের সময় উড়িয়া কলোনীতে যাই কি করে বলত? আর বড়বাজারের ঘৃতপক্ক খোট্টারা যে চিংড়ী-খেকো বাঙালীর সঙ্গে দোস্তি করবে না তা'ত জানই।"

বাক্সটা নেড়ে-চেড়ে দেখতে গিয়ে হাতে একজোড়া

কানপাশা ঠেকল। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি মহিলার পরচুলও রয়েছে। কালাচাঁদ ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বল্লে—"এই দেখনা, সিনেমা-প্রোপাইটরদের কাণ্ড! কিউ-তে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনে তখুনি অডিটোরিয়মে ঢুকতে হ'বে। ভুঁড়ি বেড়ে গেছে—আর কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট কেনা আমাদের চলে? In advance সস্তাদরে একখানা টিকিট কেটেছিলাম—অর্থাৎ 'লেডীজ্'। কাল সন্ধ্যাবেলা মেয়েদের সঙ্গে বসে সিনেমা দেখে এলুম, কেউ টের পায় নি!"

মন্ত্রমুগ্ধের মত গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ কালাচাঁদ বলে উঠ্ল, "চলি রতনদা—গান্ধীজী দিল্লী থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন; শান্তি প্রচেষ্টায় আমাকেও যোগ দিতে হবে। মানুষের কল্যাণে আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণ যদি যায়—সে ত সৌভাগ্যের কথা!" কালাচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠ্ল। প্রসন্ন মনে তাকে বিদায় দিলাম।

মানুষের মন ত! হঠাৎ মনে হল—ওর order supply এর রহস্যটি ত পরিষ্কার হ'ল না। হিন্দু-মুসলমান শিখ উড়িয়া-মাড়োয়ারী সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই ওর গতিবিধি। কোন্ সে দ্রব্য—যাতে সকলের সমান প্রয়োজন? এবং যে প্রয়োজন দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যেও অটুট থাকতে পারে? মস্তিষ্কের তলদেশ থেকে উত্তর এল—মারণাস্ত্র। তবে কি কালাচাঁদ বোমা, ষ্টেন গানের ব্যবসা করত? নইলে প্রাণ সংশয় করে order supply

এর এত গরজ কেন? ব্রহ্মদেশ থেকে কি সে এই গুপ্তবিদ্যাটি শিখে এসেছিল? নানা প্রশ্ন ভিড় করে এল মনে। সে রাত্রে ঘুম এলো না চোখে। কালাচাঁদ কি এমনই ভয়ঙ্কর বস্তু। তার বাক্সবন্দী নানা রূপের মধ্যে কোনটি তার আসল সত্ত্বা? নাঃ, সন্দেহ করব না। তার শান্তিপ্রতিষ্ঠার জয়যাত্রা সফল হোক্!



দাঁতো হাসি নয়—সত্যিকারের মধুর হাসি, উপ্‌ছে পড়া হাসি দেবদুর্লভ বস্তু। আর সেই হাসি যদি নববধূ এবং গৃহলক্ষ্মীদের মুখে ফুটে ওঠে তবে ত কথাই নেই। গুপ্তকবি বলেছিলেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।' তিনি বেঁচে থাক্‌লে আজকের এই মহাশ্মশানে বসেও হাসির কল্‌কে এক দমে ফাটাতেন। এই বইয়ের লেখক নেশার রাজ্যে অতদূর উঠ্‌তে না পারলেও কয়েক টানে যে হাসির ধোঁয়া সৃষ্টি করেছেন তা'তে ঘর আমোদ না হয়েই পারে না। এই দুর্দ্দিনে নিজের ও বন্ধু-পরিজনের মুখে অবিমিশ্র হাসি ফোটাতে চান ত পাতা উল্‌টে সরস গল্পগুলি পড়ুন এবং বিচিত্র ছবিগুলি দেখুন; হাইড্রোজেন বোমা'র ভয় অচিরেই কেটে যাবে!